মুসলিম ইতিহাসের মহাবীর
এবং জেরুজালেম জয়ের নায়ক

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী

(৫৩২-৫৮৯ হিজরী)

শাইখ আব্দুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুসলিম ইতিহাসের মহান বীর

জেরুজালেম জয়ের নায়ক

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.)

(৫৩২-৫৮৯ হিজরী)

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.)

ISBN 978-984-34-4561-2

১ম সংস্করণ
১ম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৮
২য় সংস্করণ
২য় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকাশক
রোকন উদ্দীন

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম
ওয়াফি লাইফ

প্রচ্ছদ: মো. নওয়াজিশ ইসলাম

পৃষ্ঠাসজ্জা,মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য: ২৪২ টাকা

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯

facebook.com/somorponprokashon

salah uddin ayyubi (rahimahullah) of shaikh abdullah nasih ulwan, translated into bangla by ashiq arman niloy, edited by shajid islam and published by somorpon prokashon, dhaka, bangladesh. first edition in 2018

উম্মাহর মায়েদের প্রতি

তারা যেন অন্তত আর একজন সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর জন্ম দিতে পারে।

বিষয়সূচী

অধ্যায় এক

অধ্যায় দুই

অধ্যায় তিন

চতুর্থ অধ্যায়

অধ্যায় পাঁচ

অধ্যায় ছয়

অধ্যায় সাত

অধ্যায় আট

অধ্যায় নয়

অধ্যায় দশ

অধ্যায় এগারো

অধ্যায় বারো

লেখকের আরজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যার অনুগ্রহে বান্দারা নেক আমল করতে সমর্থ হয়। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক যোদ্ধা ও বীরদের নেতা মুহাম্মাদের ﷺ উপর, তাঁর সাহাবাগণের উপর, এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল অনুসরণকারীর উপর।

দুর্ভাগ্যবশত আজ কিছু মুসলিম এই ভেবে হতাশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে যে, মুসলিমদের পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনার কোনো পথ এখন আর নেই। আবার কিছু মুসলিম আমাদেরকে সন্ন্যাসবাদের দিকে আহ্বান করে, কারণ তারা ভাবে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য বকরি নিয়ে পাহাড়ে ও বৃষ্টিময় স্থানে চলে যাওয়ার সময় চলে এসেছে। সহীহ্ বুখারিতে রয়েছে, "এমন এক সময় আসবে, যখন মুসলিমের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি হবে বকরি যা নিয়ে সে পাহাড় ও বৃষ্টিস্নাত স্থানে (উপত্যকায়) চলে যাবে, যাতে সে তার দ্বীন নিয়ে ফিতনা থেকে পালাতে পারে।" কিন্তু নবীজী ﷺ তাদের কথা বলছেন, যাদেরকে মুরতাদ হতে বাধ্য করা হবে। মুসলিমদের যতদিন ইসলামী বিধান পালনের ও পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ রয়েছে, ততদিন বৈরাগী জীবনযাপন হারাম।

আবার কিছু 'আলিম বলে থাকেন যে, ইমাম মাহদি ও ঈসা (আলাইহিমাসসালাম) আসা ছাড়া এ সমস্যা থেকে উত্তরণের কোনো পথ নেই। এ ধরনের হতাশ মনোভাব রাখা মুসলিমরা অন্য মুসলিমদের আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে। নবীজী ﷺ বলেছেন, "যে বলবে যে মুসলিমরা ধ্বংস হয়ে গেছে, সে তাদের আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

কে ভেবেছিলো যে, ক্রুসেডারদের হাতে একশ বছর পরাধীনতার পর জেরুজালেমসহ অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ড আবারও মুক্ত হবে?

কে ভাবতে পেরেছিলো যে, বীর সালাহউদ্দীন এসকল ভূখণ্ড মুক্ত করবেন এবং হাত্তিনের যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলিমদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনবেন?

কে ভাবতে পেরেছিলো যে, তাতারদের হাতে সারা মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন এবং মুসলিমদের উপর ব্যাপক হত্যা ও ধর্ষণের পর আবারও ইসলাম গৌরব ও ক্ষমতা সহকারে মাথা তুলে দাঁড়াবে? অথচ বলা হয়ে থাকে তাতারি নেতা হালাকু খাঁ মুসলিমদের খুলি দিয়ে পাহাড় গড়েছিলো।

কে বিশ্বাস করতে পেরেছিলো যে, বীর সাইফুদ্দীন কুতুয 'আইন জালুতের যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলিম বিশ্বকে মুক্ত করে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবেন?

ইতিবাচক মনোভাব একটি জাতির উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। জাতির মানুষেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

যুবসমাজের প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে সালাহউদ্দীনের (রাহিমাহুল্লাহ) জীবনী ও তাঁর বিজয়ের কারণগুলো অধ্যয়ন করার জন্য। আমি নিশ্চিত যে, মুসলিম শাসক ও যুবসমাজ যদি সালাহউদ্দীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তাহলে তারা আবারও জেরুজালেম মুক্ত করবে, ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করবে এবং ইসলামের পতাকা আবারও উঁচিয়ে ধরবে।

আল্লাহ্ বলেন

> "দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার এবং তাদেরকে নেতা ও উত্তরাধিকারী করার ইচ্ছে করলাম।"[১]

হে যুবসমাজ! ভবিষ্যতে একদিন না একদিন মুসলিমরা অবশ্যই বিজয়ী হয়ে ইসলামের গৌরব পুনরুদ্ধার করবে। এটি নবীজীর ﷺ হাদীস থেকে প্রমাণিত,

> "তোমাদের মধ্যে নবুয়ত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে

[১]সূরাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৫

নবুয়তের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণদায়ক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। এক সময় আল্লাহর ইচ্ছায় এররও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে নবুয়তের আদলে খিলাফত। তখন ইসলামের শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে জমিন ও আসমানবাসীরা খুশি হবে। তখন আসমান থেকে অবারিত বৃষ্টি ঝরবে এবং জমিন থেকে সবরকম উদ্ভিদ জন্মাবে।"

প্রতীয়মান হয় যে, বংশীয় শাসন উসমানী খিলাফাতের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা যুলুমের শাসনের অধীনে আছি, যা তুরস্কে কামাল পাশার হাতে শুরু হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামী পুনর্জাগরণের আভাস থেকে বোঝা যায় যে এই শাসন কখনই স্থায়ী হবে না। নবুয়তের আদলে খিলাফাত আবার ফিরে আসবে। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তা বাস্তবায়িত হবে বলে আমি আশা রাখি।

আমি আশাবাদী যে যুবসমাজের হাত, পুরুষদের শক্তি, দা'ঈদের অবিচলতা ও ধনীদের দানশীলতার মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হবেই। এবং আল্লাহ্র জন্য তা মোটেও কঠিন নয়। (আরও দেখুন আমার বই হাতা ইয়া'লামুশ শাবাব, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮)

পরিশেষে এই বইয়ের সকল শুভানুধ্যায়ীদের আমি ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই কবি আব্দুল জাব্বার আর-রাহবিকে তাঁর প্রশংসা, চমৎকার কবিতা ও গভীর আস্থার জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা ও কবিতা শেষ পৃষ্ঠায় পাঠকদের জন্য উল্লেখ করে দিয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের নেক আমলগুলো ইখলাসপূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে সর্বদা আমাদের সাহসী বীর পূর্বসূরিদের নিয়ে লেখার সামর্থ্য দান করুন, যাতে নতুন প্রজন্ম তা থেকে উৎসাহ লাভ করে। একমাত্র আল্লাহ্ই দু'আ কবুলকারী।

'আব্দুল্লাহ নাসিহ 'উলওয়ান (রাহিমাহুল্লাহ)

আমাদের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সমস্ত প্রশংসা মহান রবের যিনি দয়া করে আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য একটি মহৎ কাজের আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান করেছেন। মুসলিম উম্মাহ চারদিক থেকে বহিঃশত্রুদের হাতে অত্যাচারিত, নির্যাতিত হতে হতে দেয়ালে পিঠ এসে ঠেকেছে। কিন্তু ঠিক কী কারণে আমরা এভাবে অসহায় হয়ে পড়েছি, আর কোন কারণে কোটি কোটি মুসলিমের রক্ত এত সস্তা হয়ে জমিনের পর জমিন রাঙিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সময়ের দাবি। আর এক্ষেত্রে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পাঠ হতে পারে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল সময় এবং সেই সময়গুলোতে যেসব মহান ব্যক্তিরা উম্মাহর ইযযাত রক্ষায় সিনা টান করে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের ঘটনাপ্রবাহকে উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করা।

বর্তমান বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উপর কাফের-মুশরিক জোটের সম্মিলিত আগ্রাসন, পবিত্র ভূমি জেরুজালেম বে-দখল আর শামের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে আমরা ইতিহাসের মহাবীর সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর (রহঃ) সময়ের সাথে কিছুটা মেলাতে পারি। দুনিয়া আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অন্ধ মুসলিম শাসকবর্গ যখন উম্মাহকে ভুলে গিয়েছিলো, একজন সালাহউদ্দীন সেদিন একাই একটি উম্মাহ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। মিশর হয়ে শামে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন, জেরুজালেমকে কাফেরদের হাত থেকে পবিত্র করেছেন, আর সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে সাহসিকতা, বিচক্ষণতা আর মহানুভবতার যে নজির রেখে গেছেন, সেটা মুসলিম বিশ্ব তো বটেই; অমুসলিম ইতিহাসবিদরাও গুরুত্বের সাথে স্মরণ রেখেছেন।

সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বারবার মুসলিমদের সামনে তুলে আনা উচিত। সত্তরের দশকে শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ানের (রহঃ) লেখা সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর এই জীবনালেখ্য ঠিক সেই কারণেই আমরা বাংলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিই। যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণকে সামনে রেখে আমরা এই কাজে হাত দিই,

প্রথমত, এই বইটা কলেবরে এত বিশাল নয় যে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে, অথচ বইটি কম্প্রিহেনসিভ। সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর একেবারে শুরু থেকে শেষ সবকিছুই এখানে এসেছে, তবে অত বিস্তৃত পরিসরে খুঁটিনাটি নয়। পাঠক সহজেই সালাহউদ্দীনের জীবনের একটা ফ্লো-চার্ট পেয়ে যাবেন।

দ্বিতীয়ত, বইয়ের একটা বড় অংশ জুড়ে লেখক রাহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে দেখিয়েছেন কেন সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, তাঁর শক্তির জায়গাটা কোথায় ছিলো, তাঁর কৌশল কেন কাজ করেছে; পক্ষান্তরে এত বিশাল মুসলিম উম্মাহ আজ কেন এভাবে মার খাচ্ছে, আমরা কেন পেরে উঠছি না, আমাদের দুর্বলতা কোথায়!

তৃতীয়ত, লেখক যখন বইটি লিখেন তাঁর আগেই জেরুজালেম দখল করে রাখা ইসরায়েলের সাথে আরবদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সেসব ঘটনার আলোকে কীভাবে ইসলামি জিহাদ আরব জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন আদর্শ আর স্লোগানের ভিড়ে হারিয়ে গেছে, কীভাবে আমাদের ইসলামী চেতনা পরিবর্তিত হয়ে আবর্জনায় রূপ নিয়েছে তা লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে সুন্দর এবং বাস্তবিকভাবে তুলে এনেছেন, যা আমাদের চিন্তার খোরাক জোগাবে নিঃসন্দেহে।

বাংলা ভাষায় এই মূল্যবান বইটি অনুবাদ হবে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ শুরু করি। ছোটভাই নিলয়কে দায়িত্ব দিলে সে দ্রুতই কাজ শেষ করে ফেলে। এরপর বেশ কিছুদিন আমি এটার সম্পাদনার কাজ করেছি। কিছু কিছু জায়গায় টীকা সংযোজনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, সাহস করে দু'একটা সংযোজনও করেছি। অবশেষে সমপর্ণ প্রকাশনী বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়, নতুন হলেও তারা ইতিমধ্যে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের আস্থা অর্জন করেছে। আল্লাহ তাদের মেহনতকে কবুল করুন।

সবশেষে, বইটি প্রকাশিত হয়ে পাঠকের হাতে যাচ্ছে এটা আমার জন্য আনন্দের,

আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের দরবারে আবারও শুকরিয়া জানাই। এই বইটি থেকে যদি পাঠকরা উপকৃত হয়, আমাদের মায়েরা যদি তাদের সন্তানদেরকে একেকজন সালাহউদ্দীন আইয়ুবী হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন বুনে, যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মাঝে সালাহউদ্দীনের মত দ্বীনের সম্মানে ঝাঁপিয়ে পড়ার সেই পৌরুষ ফিরে আসে; তবেই আমরা সার্থক ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

সাজিদ ইসলাম

সম্পাদক

অধ্যায় এক

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর পরিবার ও বেড়ে ওঠা

বংশ

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর জন্ম এক সম্ভ্রান্ত কুর্দি পরিবারে। এই পরিবারটি মিশর ও শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন) শাসন করতো। একে বলা হতো আইয়ুবী সাম্রাজ্য। হাযিয়ানের আর-রাওয়াদিয়া[২] গোত্র ছিলো কুর্দিদের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত এবং অন্যতম বৃহত্তম গোত্র। সালাহউদ্দীনের পরিবার এই গোত্র থেকেই উদ্ভূত। ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ বলেন যে, সালাহউদ্দীনের ঊর্ধ্বতন বংশধারা 'আদনানের মুদার পর্যন্ত পৌঁছেছে। আসলে তাঁরা চেষ্টা করতেন প্রতিটি মহৎ লোকের বংশধারাকে টেনে নিয়ে আরবদের সাথে সংযুক্ত করতে। এটি কখনোই নির্মোহ গবেষণার পদ্ধতি হতে পারে না। তাঁদের ধারণা ছিলো ধার্মিকতা-নৈতিকতা কেবল আরবদের মধ্যেই আছে, অনারবরা বুঝি শক্তিশালী কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়তে অক্ষম!

আমরা যদি আমাদের ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ করি, তাহলে দেখবো যে গৌরবময় সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখা বেশিরভাগ মানুষই আসলে অনারব। কিন্তু সবাইকে টেনেহিঁচড়ে আরবদের সাথে সম্পর্কিত করার বে-ইনসাফি ধারা প্রতিষ্ঠাকারী ইতিহাসবিদরা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন। কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে।

> "মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।"[৩]

> "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে সম্মানিত, যার রয়েছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি)।"[৪]

এরপর তো আর কোনো কথাই চলতে পারে না। সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর

---

[২]এই গোত্র আজারবাইজানের দেউইন নামক গ্রামে বসবাস করতো। আর সেখানেই সালাহউদ্দীনের পিতা আইয়ুব ইবনে শাযি জন্মগ্রহণ করেন।

[৩] সূরাহ আল হুজুরাত ৪৯:১০

[৪] সূরাহ আল-হুজুরাত ৪৯:১৩

পিতার নাম নাজমুদ্দীন আইয়ুব ইবনু শাযি ইবনু মারওয়ান। তাঁর পরিবারের কিছু ইতিহাস ও অবদান নিয়েও আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

জন্ম

সুলতান ইউসুফ সালাহউদ্দীনের জন্ম হয় ৫২৩ হিজরি মোতাবেক ১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। বাগদাদের কাছাকাছি তিকরিত নামে সুপ্রাচীন গ্রামের এক দূর্গে তাঁর জন্ম। অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করা ও নজরদারি করার উদ্দেশ্যে পারস্যের সম্রাটগণ দজলা[৫] নদীর তীরে এই দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন। 'উমার বিন খাত্তাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) খিলাফতকালে ১৬ হিজরিতে মুসলিমগণ তিকরিত জয় করেন।[৬]

এটি বিভিন্ন মুসলিম শাসকের হাত ঘুরতে থাকে। তুর্কি সেলজুকগণ ক্ষমতায় আসার পর সালাহউদ্দীনের পিতা নাজমুদ্দীন আইয়ুব ইবনু শাযি বাগদাদে সেলজুক পুলিশ বাহিনীর এক বড় অফিসারের সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁর নাম মুজাহিদুদ্দীন বাহরুয। তিনি সালাহউদ্দীনের পিতা আইয়ুবকে তিকরিত দূর্গের সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেন। একইসাথে তাঁর ভাই শিরকুহ আসাদুদ্দীনকে তাঁর সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে দুই ভাই মিলে আযারবাইজানের দেউইন গ্রাম থেকে ইরাকে চলে আসেন।

তাঁরা দুজনই ছিলেন রাওয়াদিয়ান কুর্দি। তাঁরা বাহরুযের পুলিশ বাহিনীতে কাজ করতে তিকরিতে আসেন। সেই দূর্গের এক রক্ষী একজন নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। উক্ত নারী শিরকুহ'র কাছে নালিশ করলে তিনি রক্ষীকে হত্যা করে বসেন। হত্যার অপরাধে এখন শিরকুহকে কি বহিষ্কার করা হবে নাকি ছেড়ে দেওয়া হবে এ নিয়ে মুজাহিদ বাহরুয দ্বিধায় পড়ে যান। পরে ওই রক্ষীর পরিবার প্রতিশোধ নিতে পারে এই ভয়ে তিনি নাজমুদ্দীন ও শিরকুহ

[৫]নদীটির উৎপত্তি তুরস্কে। ইরাকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ইউফ্রেটিস নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং শাত আল আরব নামে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে।– সম্পাদক

[৬] মু'জামুল বুলদান, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯১

উভয়কে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁদেরকে রাতের বেলায় পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এই বহিষ্কারের দিনই নাজমুদ্দীনের স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, যার নাম রাখা হয় সালাহউদ্দীন আইয়ুবী। তাঁরা তাঁদের পরিবার ও সদ্যজাত সালাহউদ্দীন আইয়ুবীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং মসুল চলে যান।

ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান গ্রন্থে ইবনু খালিকান বলেন, নাজমুদ্দীন তাঁর এই সদ্যজাত সন্তানকে নিয়ে খুবই বিরক্ত ছিলেন। বের হওয়ার সময় তিনি ভাবছিলেন যে, বাচ্চাটির কান্নার কারণেই তাঁদের উপর দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। তিনি বাচ্চাটাকে হত্যা করে ফেলতে পর্যন্ত চাইলেন। কেউ একজন সাবধান করে দিয়ে বললো, "জনাব, সদ্যজাত শিশু তো কিছু বোঝেই না। তার উপর আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন? এটি তো আল্লাহরই নির্ধারিত তাকদির। কে জানে এই শিশুই হয়তো ভবিষ্যতে বিখ্যাত বাদশাহ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে এর যত্ন নিন।" এই কথায় নাজমুদ্দীনের হুঁশ ফিরে এলো এবং তিনি তাওবাহ করে নিয়ে আল্লাহ্র নির্ধারিত কদরের উপর ধৈর্য ধারণ করলেন।

বেড়ে ওঠা

আইয়ুব এবং শিরকুহ বাগদাদ থেকে এসে মসুলের 'ইমাদুদ্দীন যাঙ্কির সাথে থাকতে লাগলেন। বাহরুয বাগদাদের গভর্নর থাকাকালে সেলজুকদের সাথে এক যুদ্ধে 'ইমাদুদ্দীন পরাজিত হয়েছিলেন। সেসময় তিনি সৈন্যদের নিয়ে তিকরিত দিয়ে ফিরে আসছিলেন। তিকরিত দুর্গের তৎকালীন সেনাপতি নাজমুদ্দীন তাঁকে সাময়িকভাবে বন্দী করেন। তিনি 'ইমাদুদ্দীনকে হত্যা বা বন্দী করে রাখতে পারতেন। এর বদলে তিনি তাঁকে ছেড়ে দেন এবং মসুলে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। এই দুই ভাই এবার মসুলে আশ্রয় নেওয়ার পর সেই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাঁদেরকে সাদরে বরণ করে নেন এবং বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে সম্ভাষণ জানান।

তাঁদের পরিবারগুলো 'ইমাদুদ্দীনের অধীনে ভালোভাবেই দিন কাটাতে লাগলো। তার উপর 'ইমাদুদ্দীন এই দুই ভাইকে সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। ৫৩৪ হিজরিতে 'ইমাদুদ্দীন বা'আলবেক[৭] দখল করার পর নাজমুদ্দীনকে এর গভর্নর হসেবে নিয়োগ দেন। এ থেকেই বোঝা যায় নাজমুদ্দীনের প্রতি তাঁর আস্থা ও নির্ভরতা কত বেশি ছিলো।

সালাহউদ্দীনের শৈশবের একটি অংশ কিংবা বলা যেতে পারে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটি কাটে বা'আলবেকে। তিনি সেখানে অশ্বচালনা শেখেন, জিহাদের প্রশিক্ষণ নেন এবং রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনার জ্ঞান রপ্ত করেন। ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ইমাদুদ্দীনের ছেলে নূরুদ্দীন যখন দামেস্ক দখল করেন, সালাহউদ্দীন সেখানে জীবনের অসাধারণ কিছু সময় কাটান। তাঁর সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্য পূর্ণতা পায়। দামেস্কের শাসকের ছেলের মতোই তিনি মান-মর্যাদা পান। শান্ত-ভদ্র চরিত্র ও ধার্মিকতার জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তাঁর অন্তরে ছিলো দুর্দমনীয় জযবা।

নূরুদ্দীনের শাসনামলে সালাহউদ্দীন দামেস্ক পুলিশের প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান। সেখানে তিনি সুনিপুণ হাতে দামেস্ক থেকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব উচ্ছেদ করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কর্তৃত্বাধীনে মানুষ নিরাপত্তা ও শান্তিতে ছিলো। হাসসান বিন নুমাইর (ডাকনাম 'আরকালাহ) ইউসুফ সালাহউদ্দীনের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে কবিতা লিখেন।

সিরিয়ার তস্করেরা, হুঁশিয়ার সাবধান!
এসে গেছে ইউসুফ,প্রখর দূরদৃষ্টি আর জ্ঞানে মহীয়ান।
ইউসুফ নবীকে দেখে হাত কাটে নারীদের,
আর এই ইউসুফ হাত কাটে চোরেদের।

বীরত্ব ও সামরিক দক্ষতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তিনি লাভ করেন মিশরে থাকাকালীন। ৫৫৮ হিজরিতে কায়রো-কেন্দ্রিক ফাতেমি খলিফা আল-'আদিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন শাওয়ির আস-সা'দী। শাওয়ির দামেস্কে এসে নূরুদ্দীন মাহমুদের সাহায্য চান। তিনি এতে রাজি হয়ে আসাদুদ্দীন শিরকুহের নেতৃত্বে

[৭] বা'আলবেক বর্তমান সিরিয়ার একটা জেলার নাম, যা বা'আলবেক-হারমেল প্রদেশের রাজধানীও। -সম্পাদক

সেনাবাহিনী পাঠান। এই অভিযানে ভাতিজা সালাহউদ্দীনকেও সাথে নেন তিনি। সমরশৈলীতে সালাহউদ্দীন অসাধারণ নৈপুণ্য দেখান। ফলাফল, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় এবং ৫৬৪ হিজরিতে নূরুদ্দীন মাহমুদের সাম্রাজ্যের সাথে মিশরের সংযুক্তি। পরবর্তী অধ্যায়ে তা ব্যাখ্যা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মোট কথা, শৈশবে এবং যৌবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে সালাহউদ্দীন মহান গুণাবলি ও দ্বীনদারি নিয়ে বেড়ে ওঠেন। রাজ-রাজড়াদের সাথে চলাফেরা করে তিনি সামরিক দক্ষতা, আচার-প্রথা, ইসলামী জযবা, সাহিত্যগুণ ও আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করেন। এভাবেই তাঁর অসাধারণ চরিত্র গড়ে ওঠে আর ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেতে থাকে।

শিক্ষা

আগেই বলা হয়েছে সালাহউদ্দীন শৈশবে বা'আলবেকে ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর বিদ্যাপীঠ এক শহর থেকে আরেক শহরে পরিবর্তিত হতে থাকে। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের সন্তানদের মতোই তিনি লেখাপড়া, কুরআন হিফয করা ও আরবি ভাষার নিয়ম রপ্ত করেন।

তাবাকাত আশ-শাফ'ইয়্যাহর লেখক বলেন যে, সালাহউদ্দীন হাদীস শিখেন আল-হাফিয আস-সালাফি, ইবনু 'আউফ, আন-নাইসাবুরি এবং 'আব্দুল্লাহ ইবনু বাররির কাছে। তিনি ছিলেন বিচারক, কুরআনের হাফিয এবং তুখোড় কবি।

ইতিহাসবিদগণ একমত যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম, সামারকান্দ থেকে কর্ডোভা, সব জায়গা থেকে আলিমগণ দামেস্কের মাসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোতে পড়তে এবং শিক্ষকতা করতে আসতেন। সালাহউদ্দীন এঁদের সোহবত পেয়েছিলেন। বিশেষ করে আল-উমাওয়ি মাসজিদের খতিব 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবি 'আসরুনের কাছে। তাঁকে দামেস্কে এনেছিলেন নূরুদ্দীন, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের উদ্দেশ্যে দামেস্কে এবং শামের বড় বড় শহরগুলোতে প্রচুর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করেন। আবি আ'সরুন এত দক্ষ ও বিখ্যাত ছিলেন যে, তিনি দামেস্কের প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। এই আলিমকে সালাহউদ্দীন খুব সম্মান করতেন এবং যত্ন নিতেন, বিশেষত তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পর।

অশ্বচালনা, বর্শা নিক্ষেপ, শিকার ও সমরকৌশলে সালাহউদ্দীন খুবই দক্ষ ছিলেন। তিনি যে পরিবেশে থাকতেন, সেখানে এসব শেখার জন্য খুব উপযুক্ত ছিলো। ফলস্বরূপ তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান এবং যুদ্ধের ময়দানের জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারার গুণ রপ্ত করেন। এছাড়া দক্ষ যোদ্ধার মৌলিক সব গুণাবলিই তাঁর মধ্যে ছিলো। যেমন: মেধা, বুদ্ধি, বংশ, পরিবেশ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সব! একজনের ভেতর এত গুণের সমাহার খুবই দুর্লভ।

সবাই যখন দিশেহারা হয়ে পড়তো, তখনও তাঁর হৃদয় থাকতো অবিচল আর চিন্তাশক্তি থাকতো ভারসাম্যপূর্ণ। এটিও ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের একটি গুণ। উদাহরণস্বরূপ, শাম বিজয়ের সময় খবর আসে যে তাঁর ভাই তাজুল মুলুককে হত্যা করে হয়েছে। তারপর তাঁর আরেক ভাই আল-মালিক আল-মুযযাফফারের মৃত্যুসংবাদ আসে। শেষের জন ছিলেন দূর্গের নিরাপত্তা বিভাগের একজন দক্ষ প্রকৌশলী। কিন্তু এসব দুঃসংবাদ সালাহউদ্দীনকে ব্যথিত করলেও বিচলিত করতে পারেনি।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সালাহউদ্দীন ছিলেন দক্ষ রাজনীতিবিদ, অভিজ্ঞ নেতা, প্রশিক্ষিত যোদ্ধা এবং সম্মানিত আলিম। তাঁর তাকদিরে লেখাই ছিলো যে তিনি হবেন হাত্তিনের বিজয়ী বীর, ক্রুসেডারদের ত্রাস, পূর্ব-পশ্চিম সবখানে খ্যাতিমান, উত্তরসূরীদের আদর্শ এবং ইতিহাসের এক মহান চরিত্র। সালাহউদ্দীনের মতো এমন ইসলামী জযবাধারী, তেজস্বী, ইসলামের সুরক্ষিত ঘাঁটি ও নবীদের ভূমির প্রতিরক্ষাকারী আরেকটি সন্তান মুসলিম মায়েরা আর জন্ম দিতে পারেনি। কবির ভাষায়,

হায়!

এমনই ছিলেন আমার পিতাগণ!
কে আমায় এনে দেবে আবার সে রতন?

অধ্যায় দুই

সালাহউদ্দীনের শাসনামলের সূচনা

ফাতিমি শাসনাধীনে মিশর

সালাহউদ্দীনের আগমনের কিছুকাল আগে মিশর ছিলো মামলুক[৮], তুর্কি, সুদানী ও মরোক্কানদের অন্তর্কলহ ও স্থানীয়দের বিদ্রোহে বিপর্যস্ত। দুর্ভিক্ষ ও মহামারির প্রাদুর্ভাবে জনগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। খলিফা ও উজিরদের বিরুদ্ধে নানাভাবে গুপ্তহত্যার চক্রান্ত চলতে থাকতো।

ফাতিমি খলিফা তাঁর রাজ্য শাসন করতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েন। ক্ষমতা থাকতো উজির কিংবা জেনারেলদের হাতে। ফাতিমি খিলাফাতের উজিরদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে অনেক গণহত্যা আর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৫৪৯ হিজরিতে তালা'ই' ইবনু রুযযিক উজিরত্ব লাভ করলে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। কিন্তু তিনিও হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে আবারও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং ৫৫৮ হিজরি মোতাবেক ১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ছেলে রুযযিক ইবনু তালা'ই' ক্ষমতায় আরোহণ করেন।

নূরুদ্দীন ও ফ্র্যাংকিশ ক্রুসেডার রাজা আলমারিক অব জেরুসালেম (আরবিতে আল-আমুরি নামে পরিচিত) দুজনেরই মিশরের দিকে বিশেষ নজর ছিলো। উভয়ই এই এলাকা দখল করে নিজ নিজ সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করতে তৎপর ছিলেন। কিন্তু তাঁরা একে অপরের শক্তিমত্তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মিশরে উজিরতন্ত্রের দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে নূরুদ্দীন ও আলমারিক উভয়ই মিশর দখলের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

---

[৮] মামলুকরা হলো বিভিন্ন যুদ্ধে বন্দী শ্বেতাঙ্গ দাস, যাদেরকে এশিয়া মাইনর, পারস্য, মধ্য এশিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রয় করা হয়। তাদেরকে সৈনিক হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অন্যদের সাথে মেলামেশা না করে তারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জীবনযাপন করতো।

শাওয়ির আস-সা'দীর বিদ্রোহ

রুযযিক ইবনু তালা'ই' ফাতিমি খিলাফাতের উজির হওয়ার পর উঁচু মিশরের (Upper Egypt) গভর্নর শাওয়ির ইবনু মুজাইর আস-সা'দী তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি রুযযিককে পরাজিত ও হত্যা করতে সমর্থ হন এবং ৫৫৮ হিজরিতে ফাতিমি খলিফা আল-'আদিদের উযির পদে আসীন হন।

শাওয়ির আস-সা'দী ও তাঁর পুত্ররা যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তখন দুর্গাম বিন 'আমির আল-লাখামি নামক একজন জেনারেল ফাতিমি খলিফার সাথে মিলে তাঁকে হটানোর প্রস্তুতি নেন। শাওয়িরের বিরুদ্ধে খলিফা বিদ্রোহ করেন এবং তাঁকে পালাতে বাধ্য করেন। শাওয়িরের জায়গায় আসীন হন দুর্গাম। শাওয়ির আস-সা'দী তখন দামেস্কে গিয়ে নূরুদ্দীন মাহমুদের সাহায্য চান। তিনি মিশর অভিযানের খরচ এবং বার্ষিক কর হিসেবে মিশরের আয়ের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করার অঙ্গীকার করেন। নূরুদ্দীন প্রথমে এ নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন। পরে খবর এলো যে, জেরুসালেমের রাজা আলমারিক মিশর আক্রমণ করে দুর্গামকে পরাজিত করেছেন। দুর্গাম আবার শাওয়িরের সাথে নূরুদ্দীনের জোটের ভয়ে আলমারিকের সাথে সন্ধি করে তাঁকে কর দিতে শুরু করেছেন। ফলে দুর্গামের বিরুদ্ধে শাওয়িরকে সাহায্য করতে বাধ্য হন নূরুদ্দীন। তিনি আসাদুদ্দীন শিরকুহকে বাহিনীর প্রধান করে পাঠান, যিনি ভাতিজা সালাহউদ্দীনকেও সাথে করে নিয়ে যান। তাঁরা জয়লাভ করেন এবং শাওয়ির আবার উজির পদে আসীন হন।

কিন্তু নূরুদ্দীনের প্রতি নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন শাওয়ির। তিনি উল্টো গোপনে জেরুজালেমের রাজার সাথে সন্ধি করেন। আসাদুদ্দীন ও সালাহউদ্দীন তখন শাওয়িরের সাথে লড়াই করতে বাধ্য হন আর শাওয়ির জেরুসালেমের রাজার কাছে সাহায্য চান। ৫৫৯ হিজরি মোতাবেক ১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রমযান থেকে যুলহিজ্জা পর্যন্ত বুলবাইস নামক স্থানে মিশরীয় ও ক্রুসেডার জোটকে আটকে

রাখতে সমর্থ হয় শামের বাহিনী। মিশর নিয়ে জেরুসালেমের রাজার ব্যস্ততার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নূরুদ্দীন হারাম ও প্যানিয়াসের শক্ত ঘাঁটিগুলো দখল করে নেন। জেরুসালেম সম্রাট আলমারিক নিজের রাজ্য খোয়ানোর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। তিনি আসাদুদ্দীনের সাথে এই শর্তে চুক্তি করেন যে উভয় পক্ষই মিশর থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। এর মধ্য দিয়ে মিশরকে কেন্দ্র করে নূরদ্দীন ও ক্রুসেডারদের (যারা ফ্র্যাংক নামেও পরিচিত) দ্বন্দ্বের প্রথম পর্যায় শেষ হয়।

মিশরকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্যায়

মিশরে গিয়ে আসাদুদ্দীন শিরকুহ'র লাভ হয়। তিনি বিস্তর গবেষণা করে আবিষ্কার করেন যে মিশরই হলো সেই ভূমি, যাকে ব্যবহার করে তিনি ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করতে পারবেন। তিনি নূরুদ্দীনকে বিষয়টি অবগত করেন এবং একে দখল করার অনুমতি চান। নূরুদ্দীন তাতে সাড়া দিয়ে ৫৬২ হিজরিতে শিরকুহ ও সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে দ্বিতীয়বারের মতো অভিযানে প্রেরণ করেন। উজির শাওয়ির যখন শামের বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার খবর পান, তখন তিনি ক্রুসেডার মিত্রদের সাহায্য চান এবং তারা সাহায্য করতে রাজি হয়। উঁচু মিশরের মুনিয়ায় এই দুই দলের সংঘর্ষ হয়। ৫৬৩ সালে শত্রুদের বিরুদ্ধে শামের বাহিনী বিজয়ী হয়। এই যুদ্ধ সালাহউদ্দীনের বীরত্ব ও সাহসিকতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ।

শামের বাহিনী এরপর আলেক্সান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং একরকম বিনা বাধায় তা দখল করে নেয়। আসাদুদ্দীন তাঁর ভাতিজা সালাহউদ্দীনকে আলেক্সান্দ্রিয়ার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। শাসক হিসেবে সালাহউদ্দীনের এটিই অভিষেক। তাকদিরের লিখনে তিনি যেন তাঁর মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণ করার এক সুবর্ণ সুযোগ পেলেন। আসাদুদ্দীন আল-ফুস্তাত ও কায়রোতে যাওয়া মাত্রই বাইজেন্টাইন বাহিনীর সাহায্যে ক্রুসেডার বাহিনী আলেক্সান্দ্রিয়া আক্রমণ করে স্থল ও নৌ উভয় পথে এর উপর অবরোধ আরোপ করে। আলেক্সান্দ্রিয়ার

জনগণ প্রায় আত্মসমর্পণ করেই ফেলেছিলো। কিন্তু চাচার আগমনের আগ পর্যন্ত সালাহউদ্দীন শত্রুদের প্রতিরোধ করে রাখতে সমর্থ হন। ফলাফলস্বরূপ, উভয়পক্ষ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং মিশর থেকে সরে যেতে রাজি হয়।

মিশরকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের সর্বশেষ ধাপ

রাজা আলমারিক চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে কিছু সৈন্য মিশরে রেখে দেয় এবং শামের বাহিনীর চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। তারা অভিযানের প্রস্তুতি নেয়, বুলবাইস শহর দখল করে প্রচুর মানুষ হত্যা করে এবং আল-ফুস্তাত দখল করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। উজির শাওয়ির যখন খবর পান যে ক্রুসেডাররা আল-ফুস্তাত দখল করতে আসছে, তখন তিনি সেখানে আগুন ধরিয়ে দেন এবং চুয়ান্ন দিন যাবত এই অবস্থাই থাকে। ক্রুসেডাররা তখন কায়রোর দিকে অগ্রসর হয়ে একে অবরোধ করে। শাওয়ির ক্রুসেডারদের সাথে সমঝোতা করেন। এদিকে শামের বাহিনীকে তিনি পুনরায় আসার আহ্বান করেছিলেন এবং তারা এতে সাড়া দিয়ে আবারো বাহিনী প্রেরণ করে।

নূরুদ্দীন মিশর দখল করার এই সুযোগকে লুফে নেন। তিনি তৃতীয়বারের মতো শিরকুহ ও সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা এসে মিশরীয় সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হলে ক্রুসেডাররা লড়াই না করেই পালিয়ে যায়। শিরকুহ কায়রোতে প্রবেশ করার পর জনগণ তাঁকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং তাঁর মাঝে ভালো লক্ষণ আঁচ করতে পারে। ফাতিমি খলিফা আল-'আদিদ তাঁকে কাছে টেনে নেন এবং তাঁর সাথে ভালো আচরণ করেন। শাওয়ির আস-সা'দীর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র চলছিলো, যার জের ধরে ৫৬৪ হিজরিতে তিনি খুন হন। আসাদুদ্দীন শিরকুহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু মাত্র দুই মাস পরই ৫৬৪ হিজরি মোতাবেক ১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিশ্লেষণ ও মন্তব্য

এখন পর্যন্ত আলোচিত ঘটনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, চাচার সাথে মিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক জটিলতা ও যুদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সালাহউদ্দীন অসাধারণ সাহসিকতা ও প্রজ্ঞার এক দুর্লভ সমন্বয় প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ যেন তাঁকে শুরু থেকেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় চরিত্রে পরিণত করছিলেন। তিনি যেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, সেগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর অভিজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাস ও ঈমানের ঝুলিতে একেকটি অর্জন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো কীভাবে তিনি মুসলিম ভূমিগুলোকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক ইসলামী বাহিনী গড়ে তোলেন। এর ফলেই হাত্তিনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় বিজয় অর্জিত হয় এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

অধ্যায় তিন

মিশরে সালাহউদ্দীন

ফাতিমি খলিফার উজির

দুই মাস পর আসাদুদ্দীন শিরকুহ'র মৃত্যু হলে সালাহউদ্দীন তিন দিন শোক পালন করেন। বয়স ও অভিজ্ঞতায় আরো বড় বড় জেনারেলগণ থাকার পরও উজির হিসেবে আল-'আদিদ বেছে নেন ইউসুফ সালাহউদ্দীনকে। ইতিহাসবিদগণ বলেন যে, সালাহউদ্দীনকে বাছাইয়ের কারণ হলো তাঁর কম বয়সের সুযোগ নিয়ে তাঁকে হুকুমের গোলামে পরিণত করার বাসনা। তবে তাঁর তাকদিরে ছিলো একেবারেই ভিন্ন ফলাফল। উজির হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার সময় সালাহউদ্দীনের বয়স ছিলো বত্রিশ। ততদিনে নূরুদ্দীন ও আসাদুদ্দীনের সাথে থেকে থেকে সালাহউদ্দীন হয়ে উঠেছেন খুবই অভিজ্ঞ ও দক্ষ।

সালাহউদ্দীন মিশরের জনগণের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং দুহাত খুলে সম্পদ বণ্টন করেন। নাহলে তাঁর বিরুদ্ধে তারা মিশরীয় রাজকুমারদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ আচরণের ফলে মিশরবাসী তাঁকে আপন করে নিতে শুরু করে। তার উপর ফ্র্যাংকদেরকে পরাজিত করা এবং তাদের হাত থেকে দামিয়েতা, গাযা ও 'আকাবাহ মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে। এই শহরগুলোর পাশাপাশি তিনি 'আকাবাহ পোতাশ্রয় মুক্ত করেন যা ছিলো লোহিত সাগরে যাওয়ার রাস্তা। এই পথ ধরেই মিশরীয়রা মক্কায় হাজ্জের উদ্দেশ্যে গমন করতো। এই মহান বিজয় এবং হাজ্জগমনের রাস্তার নিরাপত্তা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সালাহউদ্দীন মিশরবাসীদের কাছে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। তার উপর মিশরবাসী শি'য়াদের কবল থেকে বেরিয়ে এসে সুন্নী মতবাদে যোগ দেয় এবং সালাহউদ্দীনের সাথে মিলে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর হয়।

অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের অবসান

আগেই বলা হয়েছে যে, সালাহউদ্দীন খুব অল্পবয়সে দায়িত্ব পান। ফলে ফাতিমি সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় কর্মরত কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে হিংসা করতে থাকে। বিদেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে তাদের অধিকার হরণ করতে থাকা এক আপদ হিসেবেই তাঁকে দেখতে শুরু করে। তার উপর মিশরে ফাতিমিদের প্রভাব বৃদ্ধি করতেও তারা এই নওজোয়ান উজিরের বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত করতে থাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলো খলিফাহর ঘনিষ্ঠ সহচর নাজাহ, 'ইমারাহ আল-ইয়ামানি এবং কানযুদ দাওলাহ'র ষড়যন্ত্র।

নাজাহ'র ষড়যন্ত্র

নাজাহ ছিলো সর্বশেষ ফাতিমি খলিফা আল-'আদিদের দরবারের এক খোজা পুরুষ। ৫৬৪ হিজরিতে সে সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে একদল মিশরীয়র সাথে মিলে ক্রুসেডারদের সাথে চক্রান্ত করে।

নপুংসক এই গাদ্দার ক্রুসেডারদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে মিশর আক্রমণ করার আহ্বান জানায়। তার পরিকল্পনা ছিলো ক্রুসেডাররা যখন আক্রমণ করবে তখন সালাহউদ্দীনকে পেছন থেকে আক্রমণ করে উভয় সঙ্কটে ফেলে দেওয়া। চিঠি লিখে সে একটি নতুন জুতায় তা লুকিয়ে রাখে এবং ফ্র্যাংকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়।

এর আগেই জুতোটি সালাহউদ্দীনের এক অনুসারীর হস্তগত হয় এবং সে দ্রুত সালাহউদ্দীনকে তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু সালালহউদ্দীন নাজাহ'র অনুসারীদের প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে বিষয়টি আপাতত গোপন রাখেন এবং উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকেন।

একবার নাজাহ কায়রোর বাইরে নিজের দূর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হলে সালাহউদ্দীন তাকে হত্যা করতে এক দল সৈন্য পাঠান। এই ঘটনার পর ফাতিমি খলিফার অনুসারি সৈন্যরা ফুঁসে উঠে। খলিফাহ'র পঞ্চাশ হাজার সুদানী সেনা সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়। সালাহউদ্দীনের সাথে তাদের যুদ্ধ বেঁধে যায় যা দু'দিন স্থায়ী হয়। তাদেরকে পরাজিত করে সালাহউদ্দীন নাজাহ ও সুদানী সেনাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন।

শুধু যে সুদানীরাই বিদ্রোহ করেছিলো তা না। ফাতিমি রাজকুমাররাও দেশে যুদ্ধ ও কলহের আগুন লাগিয়ে দেয়।

ইমারাহ আল-ইয়ামানির ষড়যন্ত্র

আরেকটি উল্লেখ করার মত ষড়যন্ত্র ছিলো বিখ্যাত কাহিনীকার 'ইমারাহ আল-ইয়ামানির ষড়যন্ত্র। একদিকে আল-'আদিদের এক ছেলেকে ক্ষমতায় বসিয়ে ফাতিমি শাসন পুনরুদ্ধার এবং সালাহউদ্দীনকে বিতাড়িত করার জন্য সে কায়রোতে বিশাল সমর্থকগোষ্ঠী জোগাড় করে। অন্যদিকে দ্রুত ফ্র্যাংকদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে মিশর আক্রমণের জন্য আহ্বান জানায়। বিরাট সংখ্যক সালাহউদ্দীন বিরোধী এ কাজে সাহায্য করে।

তাদের একজন পুরষ্কারের আশায় যাইনুদ্দীন ইবনু নাজাকে ডেকে সালাহউদ্দিনের হাতে ধরিয়ে দেয়। সালাহউদ্দীন তাদের সবাইকে হত্যা করে দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই ষড়যন্ত্র সংঘটিত হয় ৫৬৯ হিজরি সনে।

কানযুদ দাওলাহ'র ষড়যন্ত্র

আসওয়ান এবং কুসে[৯] ৫৭০ হিজরিতে আরেকটি ষড়যন্ত্র হয়। আল-মাকরিযি তাঁর আস-সুলুক লি মা'রিফাত দিওয়ালাল মুলুক গ্রন্থে এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে লেখেন:

৫৭০ হিজরি সনে আসওয়ানের শাসক কানযুদ দাওলাহ্ আরব ও সুদানীদেরকে জড়ো করেন। তারা ফাতিমি সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সোজা কায়রোর দিকে অগ্রসর হয়। সে এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। আরেকটি দল তাদের সাথে যোগ দিয়ে সালাহউদ্দীনের অনুসারী দশজন রাজকুমারকে হত্যা করে। তুদ গ্রামের কিয়াস ইবনু শাদি নামের এক লোক কুস আক্রমণ করে এর সম্পদ লুণ্ঠন করে। ভাই আল-মালিকুল 'আদিলের নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী তৈরি করে সালাহউদ্দীন তাদেরকে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেন। আল-মালিকুল 'আদিল কিয়াসকে হত্যা করে তার সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। এরপর তিনি কানযুদ দাওলাহ্র উদ্দেশ্যে তুদে যান। কানযুদ দাওলাহ'র বেশিরভাগ সৈন্য নিহত হলে পরাজয়ের ভয়ে সে পালিয়ে যায়। সফর মাসের ৭ তারিখ তাকে হত্যা করা হয়। যুদ্ধ শেষে আল-মালিকুল 'আদিল কায়রোতে ফেরেন ১৮ই সফর।

এভাবে সালাহউদ্দীন ঘরের শত্রু যালিম ষড়যন্ত্রকারীদেরকে দমন করেন। প্রজাদের কল্যাণকল্পে তাঁর দৃঢ়তার আরেকটি দৃষ্টান্ত এটি। মুতানাব্বির কথাগুলো যেন তাঁরই চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করছে:

"বিপদ তো তাদেরই আসে যারা একে সইতে জানে,
সদাচার থাকে তাদেরই মাঝে যারা ভরপুর সম্মানে।
ছোট জিনিসকে বড় করে দেখে যতসব ছোটলোকে,
বড় জিনিসও ছোট হয়ে যায় বড়দের চোখে।"

---

[৯] আসওয়ান মিশরে অবস্থিত আসওয়ান প্রদেশের রাজধানী। আর কুস বর্তমানে মিশরের কুয়েনা প্রদেশের একটি শহর। - সম্পাদক

বহিঃশত্রুদের ষড়যন্ত্র দমন

সালাহউদ্দীন মিশরের শাসনভার পাওয়ার পর ফ্র্যাংকরা তাঁর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তারা ভয়ে ভয়ে ছিলো যে মুসলিমরা তাঁর সাথে মিলে পবিত্র ভূমি জেরুসালেম মুক্ত করতে চলে আসে কি না। তাঁকে হটানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো তারা।

তাদের প্রথম প্রচেষ্টা ছিলো দামিয়েট্টা আক্রমণের। সালাহউদ্দীন মিশরে থিতু হওয়ার পর পুর্বদিকের ফ্র্যাংকরা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলো। তারা স্পেন ও সিসিলিতে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে জেরুসালেম হুমকির মুখে পড়েছে বলে উত্তেজিত করতে লাগলো। এছাড়া পাদ্রী-সন্ন্যাসীদেরকেও টাকাপয়সা আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাদের কাছে পাঠালো যাতে তারা জনগণকে উৎসাহিত করে।

এর পরপরই ৫৬৪ হিজরিতে তাদের সেনাবাহিনী দামিয়েট্টা অবরোধ করে। সালাহউদ্দীন একদল অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনীকে নীলনদ হয়ে দামিয়েট্টায় প্রেরণ করলেন। এছাড়া তিনি নূরুদ্দীনকেও সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন। নূরুদ্দীন এই আহবানে সাড়া দেন। মিশরে তিনি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন এবং পূর্বদিক ও ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের বড় বড় ঘাঁটিগুলোতে নিজের বাহিনীসহ সশরীরে হাজির হন। মিশরে সেনা আসতে দেখে আর তাদের ভূখণ্ডে নূরুদ্দীনকে ঢুকতে দেখে ক্রুসেডাররা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। তারা দামিয়েট্টায় পঞ্চাশ দিন অবস্থান করে বিফল হয়।

পাঁচ বছর পর ৫৬৯ হিজরিতে সিসিলির ফ্র্যাংকরা আলেক্সান্দ্রিয়া আক্রমণ করে। পনেরশ ঘোড়া, অশ্বারোহী আর পদাতিক মিলিয়ে ত্রিশ হাজার যোদ্ধা, অস্ত্র, রসদ, মিনজানিক[১০], গোলন্দাজ যান এবং নৌকা নিয়ে তাদের বহর

---

[১০] মিনজানিক এক ধরণের গুলতি যা পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর যুদ্ধক্ষেত্রে সুরক্ষিত দূর্গ আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত হতো। - সম্পাদক

উপকূলে ভেড়ে। তীরে নেমেই তারা সাতজন মুসলিম সেনাকে হত্যা করে, মুসলিমদের কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয় এবং তিনশ তাঁবু গেড়ে বসে। এরপর তারা আলেক্সান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হয়।

সালাহউদ্দীন তখন ফাকুস[১১] শহরে ছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি যখন জানলেন যে আলেক্সান্দ্রিয়া ঘিরে ফেলা হয়েছে, তখন তিনি অস্ত্র ও গোলাসজ্জিত এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। চতুর্থ দিনের বিকেল পর্যন্ত সংঘর্ষ স্থায়ী হয়। সালাহউদ্দীন তাদেরকে পরাজিত করে তাদের প্রচুর সেনা হত্যা করেন, জাহাজ ডুবিয়ে দেন, তাদের রসদ ও অস্ত্র গানীমাত হিসেবে লাভ করেন। সালাহউদ্দীন ও তাঁর সেনাবাহিনীর বীরত্বের কাছে শত্রুদের অবরোধ চূর্ণ হয় আর তাদের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সালাহউদ্দীনের বাহিনীর তলোয়ারের ধার থেকে যারা বেঁচে গেলো তারা হতাশ হয়ে শূন্য হাতে দেশে ফিরে যায়।

সালাহউদ্দীন এভাবে দুই-দুইবার মিশরকে উদ্ধার করেন এবং ফ্র্যাংকদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন। তিনি ছিলেন ক্রুসেডারদের গলায় ধরা এক তরবারি আর ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত এক সিংহ।

আব্বাসি খলিফার নামে পঠিত খুতবা

ভেতর-বাহিরের শত্রুদেরকে ধ্বংস করে থিতু হওয়ার পর নিজে স্বাধীনভাবে কাজ করার পথে অন্যান্য বাধাগুলো সরাতে তৎপর হয়ে ওঠেন সালাহউদ্দীন। রাসূলুল্লাহর ﷺ আহলে বাইতকে সম্মান জানাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা মিশরবাসী শি'য়া মতবাদের অনুসারী হয়ে গিয়েছিলো। সালাহউদ্দীন মিশরবাসীকে আহলুস সুন্নাহর মতবাদের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তিনি দুটি বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যাতে মানুষ সঠিক মতবাদ শিখতে ও অনুসরণ করতে পারে। এ দুটি হলো নাসারিয়াহ মাদ্রাসা ও কামিলিয়া মাদ্রাসা। সহজেই তিনি পরিবর্তন আনতে সমর্থ

[১১] ফাকুস বর্তমান মিশরের আশ-শারকিয়্যাহ প্রদেশের একটি শহর। - সম্পাদক

হন। কারণ এদিকে নূরুদ্দীনও তাঁকে অনুরোধ করেন জুমু'আর খুতবা ফাতিমি খলিফার নামে না পড়ে আব্বাসি খলিফার নামে পড়তে। এভাবে ফাতিমিদের প্রভাব আরো দুর্বল হয়ে গেলো। শুধু সালাহউদ্দীনই নন, সমগ্র মুসলিম বিশ্বই এই পরিবর্তন খুব করে চাইছিলো। সালাহউদ্দীনের খতীব আল-'ইমাদ তাঁকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতায় বলেন,

ফিরিয়ে আনুন এই খিলাফাহ আব্বাসিদের হাতে
মিথ্যাবাদীর দলেরা থাকুক মৃত্যুতে তড়পাতে।
ষড়যন্ত্র টের পেলেই করে দেবেন নস্যাৎ
মনের সকল দ্বন্দ্ব-দ্বিধা করুন ধূলিসাৎ।

কিন্তু সালাহউদ্দীন ভাবলেন মিশরীয়দেরকে পরিপূর্ণরূপে সুন্নী ধারায় ফিরিয়ে আনার আগ পর্যন্ত খুতবার পরিবর্তনটি স্থগিত রাখা উচিত। ফাতিমি খলিফা অসুস্থ হয়ে পড়লে নূরুদ্দীন বিষয়টি নিয়ে আরো জোরাজুরি করতে লাগলেন। সালাহউদ্দীন তাঁর উপদেষ্টাদের জড়ো করে তাঁদের মতামত চাইলেন। সেই সভায় "আলিমগণের যুবরাজ" খ্যাত আল-আমির আল-'আলিম এই দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। তিনি পরের জুমু'আর খুতবায় ফাতিমি খলিফার বদলে আব্বাসি খলিফার নামে খুতবা দিলেন। সালাহউদ্দীন তাঁর অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিলেন ফাতিমি খলিফার কাছ থেকে বিষয়টি আপাতত গোপন রাখতে। তিনি বলেন, "তিনি সুস্থ হলে একে স্বীকৃতি দেবেন। আর যদি তিনি মৃত্যুপথযাত্রী হন, তাহলে তাঁকে এই দুঃসংবাদ জানানো ঠিক হবে না।"

ইবনু আসির তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, জনগণ খুতবার এই পরিবর্তনকে শান্তভাবে মেনে নিয়েছিলো। অবশেষে ৫৬৭ হিজরি মোতাবেক ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে আল-'আদিদের মৃত্যুর মাধ্যমে ফাতিমি যুগের অবসান ঘটে।

আল-'আদিদের মৃত্যুর পর মিশরে সালাহউদ্দীনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আল-'আদিদের মৃত্যুতে তিনদিন শোক পালন করেন এবং তাঁর পরিবারের সাথে সম্মানসূচক ও দয়ালু আচরণ করেন।

নূরুদ্দীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক

ফাতিমি খলিফার মৃত্যুর পর নূরুদ্দীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে তৎপর হয়ে ওঠেন সালাহউদ্দীন। অন্যথায় নূরুদ্দীনের মনে হতে পারতো যে সালাহউদ্দীন ক্ষমতায় জেঁকে বসতে চাইছেন। শিরকুহ'র সময় থেকে নূরুদ্দীনের সাথে যে ভালো বোঝাপড়া চলে আসছিলো, তা তিনি বজায় রাখেন। যৌবনে তাঁর প্রতি নূরুদ্দীনের অনুগ্রহকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণে রাখেন।

কিছু সময় পরই আব্বাসি খলিফার পরিবর্তে নূরুদ্দীনের নামে খুতবা দেওয়ার আদেশ দেন সালাহউদ্দীন। তিনি তাঁর নাম খচিত মুদ্রা প্রচলন করেন এবং তাঁকে প্রাসাদের কোষাগার থেকে উপঢৌকন পাঠান।

মিশরে সালাহউদ্দীনের শাসনামলে কিছু বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি তাঁকে অমান্য করে এবং মিশরে বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা সালাহউদ্দীনের সাথে নূরুদ্দীনের কলহ বাঁধিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং এই হীন প্রচেষ্টায় কিছু মাত্রায় সফলও হয়। কিন্তু প্রজ্ঞাবান জনগণ এই চক্রান্তগুলো ধরে ফেলে এবং উভয়পক্ষকে সুপরামর্শ দিয়ে শত্রুতার কুফল বোঝায়। অন্তর্কলহ থেকে কেবল বহিঃশত্রুরাই উপকৃত হয়। অল্প সময়ের মাঝেই উভয় পক্ষের মাঝে আস্থা পুনরুদ্ধার হয়। ৫৬৯ হিজরি তথা ১১৭ নূরুদ্দীনের মৃত্যু পর্যন্ত সালাহউদ্দীন তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সালাহউদ্দীন স্বাধীনতার পথে সব বাধা দূর করতে সমর্থ হন এবং প্রাচ্যের মুসলিমদের পক্ষে এক দুর্জয় শাসক ও যোদ্ধায় পরিণত হন। বিভিন্ন সময় ক্রুসেডারদের যুলুমে মুসলিমদের যে ক্ষতি হয়েছিলো, আল্লাহ তার কড়ায়-গণ্ডায় শোধ তোলার নিয়তি লিখে দিয়েছেন সালাহউদ্দীনের জন্য। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা করবো সালাহউদ্দীন কীভাবে

মুসলিম ভূমিগুলোকে নিজের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং হাত্তিনের মহাগুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে ইসলাম ও মুসলিমদের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন।

> "এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি দান করেন। এবং আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ।"[১২]

[১২] সূরাহ আল-মা'ইদাহ ৫:৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

সিরিয়ায় সালাহউদ্দীন

নূরুদ্দীনের পর সিরিয়ার অবস্থা

নূরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আল-মালিক আস-সালিহ ইসমা'ঈল তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি তখনো সাবালক হননি, বয়স ছিলো মাত্র এগার বছর। তাঁর অভিভাবক ছিলেন শামসুদ্দীন ইবনুল মুকাদিম। শামের রাজকুমারেরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতো। একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে দুর্নাম ও চক্রান্ত করে তাদেরকে দুর্বল করতে চেষ্টা করতো। নাবালক রাজা এসবের কিছুই বুঝতেন না। ব্যক্তিস্বার্থে সিংহাসনে আরোহণের চেষ্টায় লিপ্ত রাজকুমারদের হাতের গুটিতে পরিণত হন তিনি।

আল-মালিক আস-সালিহ'র জ্ঞাতিভাই এবং মসুলের শাসক সাইফুদ্দীন আল-জাযিরাহতে (দজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী ভূমি) নূরুদ্দীনের শহরগুলো দখল করে ফেলেন এবং রাজকুমারদেরকে স্বাধীনভাবে তা শাসন করার অনুমতি দেন। কিছু রাজকুমার অন্য রাজকুমারদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়ার জন্য ক্রুসেডারদের সাথে সন্ধি করে। ক্ষমতা দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতি হতে থাকে। এই যিল্লতির জীবন থেকে এই ভূমিকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ বেছে নেন সালাহউদ্দীনকে।

দামেস্ক থেকে সালাহউদ্দীনেকে তলব

সালাহউদ্দীন এই কলহ-বিবাদের কথা জানতেন। কিন্তু তিনি হস্তক্ষেপ করার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। ভুল সময়ে নাক গলিয়ে শামবাসীদের

ক্রোধের কারণ হতে চাচ্ছিলেন না তিনি। তিনি নিয়মিত আল-মালিক আস-সালিহ ইসমা'ঈলের কাছে বার্তা পাঠিয়ে নিজের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার কথা জানান দিতে থাকতেন। তিনি তাঁর নাম খচিত মুদ্রা প্রচলন করেন, তাঁর নামে জুমু'আর খুতবা দেওয়ার আদেশ করেন এবং শামবাসীকে দেখাতে থাকেন যে তিনি নাবালক রাজার ব্যাপারে যত্নশীল।

দামেস্কবাসীরা জানতো যে সাইফুদ্দীন আল-জাযিরাহ দখল করে ফেলেছে, শামসুদ্দীন ক্রুসেডারদের সাথে সন্ধি করে ফন্দি আঁটছে আর নূরুদ্দীনের ছেলেরা সিংহাসনে চড়ার প্রতিযোগিতায় লেগে আছে। কাজেই শামবাসীরা সালাহউদ্দীনের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার আহ্বান জানায়।

দামেস্কে সালাহউদ্দীন

সালাহউদ্দীন এই দাওয়াত পেয়ে খুবই খুশি হন। কারণ এর মাধ্যমে শামের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার বৈধতা হাসিল হয়েছে। তিনি ফ্র্যাংকদের তোয়াক্কা না করে দামেস্কে চলে যান। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেন এবং নিজের সামর্থ্যের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী থাকেন।

তিনি বসরা হয়ে যান। সেখানকার রাজকুমার তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। ৫৭০ হিজরি (১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) সনের রবিউল আউয়াল মাসে তিনি দামেস্কে পৌঁছান। দুর্গকে তাঁর কাছে সমর্পণ না করা পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার আবাসস্থলে অবস্থান করেন। তারপর তিনি দুর্গের দিকে অগ্রসর হন এবং এর ধনসম্পদ হস্তগত করেন। তিনি দুনিয়াবি সম্পদ ও ভোগ-বিলাসিতার জন্য সম্পদ হস্তগত করতেন না। পরিমিত সম্পদ দিয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর চরিত্র সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। এছাড়া তিনি দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাহলে সালাহউদ্দীন এই অর্জিত সম্পদ দিয়ে কী করতেন? তিনি ইসলামী বিধান অনুযায়ী দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূরীকরণ এবং জনগণের স্বার্থ

রক্ষার জন্যই দরিদ্র ও অভাবীদের মাঝে এই সম্পদ বিতরণ করতেন।

রাষ্ট্রীয় সম্মাননার মধ্য দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। সবাই তাঁর উপর আশা-ভরসা করে এবং মুসলিম ভূমিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে জেরুজালেম মুক্ত করার জন্য প্রত্যয়ী হয়।

কবিগণ তাঁকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং বহুল আকাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনতে প্রেরণা দিতে থাকেন। ওয়াজিশ আল-'আসাদি তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখেন:

বিজয় নিশান উঁচিয়ে তুলে ওড়ালেন কতবারই
আরো বিজয় ছিনিয়ে আনুক আপনার তরবারি।
রবের কসম! এমনই এক সিংহ সালাহউদ্দীন
ঝাঁপ দিলে সে শিকার পড়ে লুটিয়ে প্রাণহীন।
জাল্লাক যবে মিনতি করে, "বাঁচাও আমায় বাঁচাও!"
কেউ দেখে না, কেউ ফেরে না, শুধুই "পালাও পালাও!"
আপনি ঠিকই জয় করলেন দুর্গম সে পারাবার,
গড়লেন যা ভেঙে পড়েছিলো শক্ত হাতে আবার।
মিশরে যেভাবে প্রাণ ফেরালেন ক্ষণে ক্ষণে বারবার,
সেখানেও ঠিক ঘটলো সেটাই, ফিরে এলো ন্যায়বিচার।
ইসলামী নিশান উড়িয়ে দিলেন দিক-দিগন্ত জুড়ে,
লাঞ্ছিত হলো কাফির ক্রুসেডার পালালো সব পিছু মুড়ে।
দুনিয়াবি কোনো প্রশংসার দিকে তাকালেন না ফিরে
ভোগ-বিলাসকে পায়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন দূরে।
শামকে যদি না বাঁচাতে তুমি ধ্বংস হতো এর সবই,
স্মৃতি হয়ে শুধু রয়ে যেতো যে হৃদয়ে আঁকা ছবি।

নাশু আদ-দাওলাহ আবুল ফাদল তাঁর কবিতায় লেখেন:

দু'আর জবাবে আল্লাহ পাঠালেন দামেস্কে সালাহউদ্দীন

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন!
রাজা হয়েও তিনি এক আল্লাহর গোলামি করেন খুব
কী জানি কোন যাদুবলে তাঁকে চেনে প্রতীচী-পূব।

সালাহউদ্দীন দামেস্কের বিচারালয়ে বসে সব অবিচার দূর করতে শুরু করেন। যালিম শাসকদের চাপানো করের বোঝা থেকে জনগণকে মুক্ত করেন। সা'আদাহ্ ইবনু 'আব্দুল্লাহ একটি কবিতায় তাঁর ব্যাপারে বলেন:

দামেস্কের সব অবিচার দূর করার জারি হলো ফরমান
মুকুটের সাথে সাথে পেলেন রাজা জনগণের সম্মান
ফল ছিঁড়ে খায়, ঘুরে ফিরে দেখে প্রজারা ন্যায়বিচারের বাগান।

দামেস্কের ক্ষমতায় থিতু হওয়ার পর সালাহউদ্দীন তাঁর বক্তব্য-বক্তৃতায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তিনি আল-মালিক আস-সালিহকে সাহায্য করার জন্যই এসেছেন। উদাহরণস্বরূপ, দামেস্কের ক্ষমতা পাওয়ার পর তিনি হালাব (আলেপ্পো)-এর দূতকে বলেন, "জেনে রাখবেন, আমি দামেস্কে এসেছি কেবল ইসলামের ভূখণ্ডগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা, পরিস্থিতি ঠিক করা, জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা, নুরুদ্দীনের ছেলেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও যুলুমের অপসারণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে।"

হোমস, হামাহ ও হালাব

দামেস্ক অধিকারের পর তিনি অল্প সময় সেখানে অবস্থান করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যায় অবিচার দূর করেন। তারপর তিনি তাঁর ভাই সাইফুদ্দীন তাগতাকিনকে সেখানকার শাসক হিসেব নিযুক্ত করে হোমসের দিকে অগ্রসর হন। তিনি এর দূর্গটি ছাড়া পুরো শহরই দখল করেন। সালাহউদ্দীন সেখানে বেশি সময় নষ্ট করলেন না। তাঁর সেনাপতিদেরকে দূর্গ অবরোধের জন্য রেখে হামাহ'র

দিকে অগ্রসর হলেন। হামাহ'র শাসক ছিলেন 'ইযযুদ্দীন জুরদিক, যিনি মিশরের তৃতীয় অভিযানে সালাহউদ্দীনের লেফটেন্যান্ট ছিলেন। তিনি অবশ্য প্রথমে আত্মসমর্পণ করেননি। কিন্তু সালাহউদ্দীন তাঁকে জানালেন যে, তাঁর আসার উদ্দেশ্য হলো শহরটিকে ফ্র্যাংকদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং মসুলের শাসক সাইফুদ্দীনের হাত থেকে আল-জাযিরাহ মুক্ত করা। এছাড়া আল-মালিক আল-সালিহ ইসমা'ঈলের প্রতি নিজের আনুগত্যের কথাও জানালেন। জুরদিক এবার শুধু আত্মসমর্পণই করলেন না, হালাবের শাসক সা'দুদ্দীন কামাশতাকিনের কাছে সালাহউদ্দীনের দূত হিসেবে কাজ করতেও রাজি হয়ে গেলেন।

হালাবের আসল শাসক শামসুদ্দীন ইবনুদ দায়াহ-কে হটিয়ে তা দখল করেছিলেন সা'দুদ্দীন। তিনি ইবনুদ দায়াহ ও তার ভাই ও পুত্রদের বন্দী করে ক্রুসেডারদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। অন্যায় দখলকারী কামাশতাকিনের কাছে জুরদিককে দিয়ে সালাহউদ্দীন বার্তা পাঠালেন যেন ইবনুদ দায়াহ সহ সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। জুরদিক এই বার্তা নিয়ে হালাবে পৌঁছলে কামাশতাকিন তাঁকেও বন্দী করেন। কিন্তু তাঁর জানা ছিলো না যে সালাহউদ্দীন তাকে এই সব যুলুমের মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য করবেন।

কামাশতাকিন শুধু এটুকু করেই ক্ষান্ত হননি। মিসইয়াফে অবস্থানকারী এবং ইসমা'ঈলিয়্যাহ[১৩] গোষ্ঠীর রাশিদুদ্দীন সিনানের কাছে সাহায্য চেয়ে তিনি বার্তাও পাঠান। সালাহউদ্দীনকে হত্যা করতে রশিদুদ্দীন একটি গুণ্ডাদল পাঠান। তারা সালাহউদ্দীনকে অনুসরণ করতে করতে হালাবের পশ্চিমে অবস্থিত জুশান শিবির পর্যন্ত যায়। কিন্তু তারা তাঁর তাঁবুতে ঢুকতে পারার আগেই সৈনিকরা তাদেরকে আক্রমণ করে।

৫৭১ হিজরিতে 'আযায নামে হালাবের একটি গ্রামে সালাহউদ্দীনের অবস্থানকালে এরকম আরেকটি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। কিছু আত্মঘাতী হামলাকারী তাঁর তাঁবু আক্রমণ করে। তাঁর দেহরক্ষীদের মতো পোশাক পরে তিনজন লোক তাঁর তাঁবুতে ঢুকে যায় এবং তাঁর মাথায় আঘাত করে। তিনি প্রায়

[১৩] ফাদা'ইহ আল আল-বাতিনিয়্যাহ 'আন মাবাদি' আল-ইসমা'ঈলিয়্যাহ গ্রন্থে ইমাম গাযালি বলেন যে, এই গোষ্ঠীটি বাহ্যিকভাবে শি'য়াদের একটি উপদল হলেও ভেতরে ভেতরে তারা পাক্কা কাফির। তারা হিজাবের বিধানে বিশ্বাস করে না। অনেক হারামকে হালাল বানায়। অন্যান্য ধর্মকে অস্বীকার করে না। কিন্তু তারা এসব বিশ্বাসকে ইসমা'ঈল জা'ফার আস-সাদিকের থেকে পাওয়া বলে দাবি করে।

মারাই যাচ্ছিলেন কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর পরিহিত বর্ম আচ্ছাদিত জামার কারণে আঘাত এরচেয়ে গুরুতর হতে পারেনি। ইসমা'ঈলী আত্মঘাতী হামলাকারীরা সালাহউদ্দীনের দেহরক্ষীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং উভয়পক্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটে। অন্য সৈন্যরা সাথে এসে যোগ দিলে আত্মঘাতী হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। সৈন্যরা তাদেরকে ধাওয়া করে ও তাদের কয়েকজনকে হত্যা করতে সমর্থ হয়।

সুলতান সালাহউদ্দীন প্রতিশোধের পরিকল্পনা করেন। পরের বছর হালাব থেকে ফিরে এসে তিনি হামাহ'র পশ্চিম দিকে মিসইয়াফে তাদের দূর্গের দিকে যাত্রা করেন। তিনি তাদের জন্য মিনজানিকের ব্যবস্থা করেন। তাদের বহু সংখ্যককে হত্যা ও বন্দী করেন। তারা যেসব অর্থ ও গবাদি পশু ছিনিয়ে নিয়েছিলো তা উসুল করে নেন এবং তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আসেন।

কামাশতাকিন হতাশ হয়ে এবার ক্রুসেডারদের সাহায্য চান। ক্রুসেডাররা এতে সাড়া দিয়ে তৃতীয় রেইমন্ডের নেতৃতে একটি বাহিনী প্রেরণ করে। সালাহউদ্দীন এরই মধ্যে হালাব মুক্ত করে ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে হোমসের দিকে রওনা করেন। ক্রুসেডাররা সালাহউদ্দীনের আসার খবর পেয়েই পালিয়ে যায়। সালাহউদ্দীন তারপর দামেস্কে গিয়ে বা'আলবেক দখল করেন।

নূরুদ্দীনের ছেলেদের ষড়যন্ত্রের কারণে সালাহউদ্দীনকে এসময় অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শামের বেশ কিছু শহর সালাহউদ্দীনের দখলে আসার পর নূরুদ্দীনের ছেলেরা ভাবে যে তিনি আরো অঞ্চল দখল করে ক্ষমতায় গেড়ে বসবেন। তারা মসুলের শাসক সাইফুদ্দীন গাযিকে অনুরোধ করে তিনি যেন তার জ্ঞাতিভাই আল-মালিক আস-সালিহকে সাহায্য করেন। তিনি আল-মালিকের সাহায্যার্থে সেনা, অস্ত্র ও রসদ প্রস্তত করেন।

তিনি হালাবে এসে হালাবের বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সালাহউদ্দীন দেখলেন যে এই সংঘর্ষের ফলে অযথা রক্তপাত হবে আর এর সুফল ভোগ করবে ফ্র্যাংকরা। তিনি সমঝোতার আহ্বান জানান। তিনি এই শর্তে সব বিজিত শহর তাদেরকে দিয়ে দিতে রাজি হলেন যে, রাজার পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত শাসক হিসেবে তিনি দামেস্কে থাকবেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তা মেনে

না নিয়ে সব শহর ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে মিশরে ফেরত যেতে বলে। ফলে লড়াই করা ছাড়া সালাহউদ্দীনের সামনে আর কোনো বিকল্প থাকলো না।

এক আরব কবি বলেন:

কণ্টকাকীর্ণ পথই যখন একমাত্র পথ
তখন এ পথেই চলার নিতে হয় শপথ।

সালাহউদ্দীন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন এবং হামাহ'র নিকটবর্তী স্থানে ৫৭০ হিজরি সনের ৯ই রমাদ্বান তাদের মুখোমুখি হন। তুমুল আক্রমণ করে তিনি তাদেরকে এতই ভড়কে দেন যে পরিস্থিতির ভয়াবহতায় কোনো সৈনিক আর তার সহকর্মীর খোঁজ নিচ্ছিলো না। তারা হালাবে পালিয়ে যায়। সালাহউদ্দীন তাদেরকে ধাওয়া করে তাদের রসদ ছিনিয়ে নেন ও হালাবে তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। পরাজয়ের পর সাইফুদ্দীন পুনরায় প্রস্তুতি নিতে মসুলে ফিরে যায়। সালাহউদ্দীন তাঁকে ধাওয়া করে সুলতান পাহাড়ে তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সালাহউদ্দীন আবারো জয়লাভ করে মসুলের বাহিনীর বেশিরভাগকে বন্দী করে তাদের মালপত্র হস্তগত করেন।

এরপর সালাহউদ্দীন বাযা'আহ-তে[১৪] যান এবং তাঁর হাতে দূর্গের পতন ঘটে। এরপর তিনি মানবাজ দখল করেন এবং 'আযায দূর্গের পতনের আগ পর্যন্ত তা আবরোধ করে রাখেন। তিনি আবার হালাবের দিকে অগ্রসর হন। হালাব অবরোধ করে রাখার সময় নূরুদ্দীনের কন্যা, আল-মালিক আস-সালিহ'র বোন সালাহউদ্দীনের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে আসেন। সালাহউদ্দীন তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান ও অনেক দামী দামী উপহার দেন। তিনি তাঁর প্রজাদের দাবি-দাওয়া জানতে চান। আল-মালিকের বোন জানান যে তারা 'আযায চায়। নূরুদ্দীনের যথাযথ সম্মানে সালাহউদ্দীন 'আযায ফিরিয়ে দেন ও তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে হালাবের ভেতর পৌঁছে দিয়ে আসেন।

অবরোধ চরমে পৌঁছলে আল-মালিক আস-সালিহ প্রজাদের সাথে পরামর্শ করে সমঝোতা করতে রাজি হন। তিনি শর্ত দেন যে সালাহউদ্দীনের জয় করা শহরগুলোই শুধু তাঁর অধীনে থাকবে। চুক্তি অনুযায়ী সালাহউদ্দীন দামেস্ক,

[১৪] বাযা'আহ বর্তমান সিরিয়ার আলেপ্পো প্রদেশের একটি শহর।– সম্পাদক

হোমস, হামাহ, আল-মা'আররাহ এবং আরো কিছু ছোট শহর ও সেগুলোর দূর্গের অধিকারী হন। আল-মালিক আস-সালিহ'র দখলে থাকে কেবল হালাব ও এর সংলগ্ন কিছু শহর।

এই সমঝোতার পর সালাহউদ্দীন ৫৭৬ হিজরিতে মিশরের অবস্থা তদারক করতে সেখানে ফেরত আসেন। তিনি মিশর পৌঁছতে না পৌঁছতেই খবর আসে যে আল-মালিক আস-সালিহ'র মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স ছিলো মাত্র উনিশ বছর। তিনি অসিয়ত করে যান যে তাঁর জ্ঞাতিভাই ও মসুলের শাসক 'ইযযুদ্দীন মাস'উদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। 'ইযযুদ্দীন খবর পাওয়ার সাথে সাথে মসুল ত্যাগ করে হালাবের দিকে রওনা দেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই তাঁর ভাই ও সিনজিরের[১৫] শাসক 'ইমাদুদ্দীন তাঁর সাথে স্থান বিনিময় করার প্রস্তাব দেন। 'ইযযুদ্দীন তাতে সাড়া দিয়ে নিজে সিনজিরের শাসক হন। আর 'ইমাদুদ্দীন ৫৭৮ হিজরির ১৩ই মুহাররম হালাবের শাসক হিসেব দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরে হালাব বিজয় করে 'ইমাদুদ্দীনকে নিজের বশ্যতা স্বীকার করান সালাহউদ্দীন। ৫৭৯ হিজরির ১৭ই সফর জনগণ তাঁকে সানন্দে বরণ করে। কবি ও কাহিনীকারেরা তাঁর কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আর তাঁর অমর কীর্তিগাঁথা নিয়ে কবিতা রচনা করে। দামেস্কের কাযি মহিউদ্দীন ইবনুয যাকি বলেন:

সফর মাসে আপনার তলোয়ারে হালাব বিজয়
যেন রজবে জেরুসালেম বিজয়ের লক্ষণ হয়।

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হালাব বিজয়ের চার মাস পর ঠিক রজব মাসেই জেরুসালেম বিজয় হয়। হালাব বিজয়ের পর কবিতায় যারা সালাহউদ্দীনের প্রশংসা করেন, তাঁদের একজন ইউসুফ আল-বারা'ই বলেন:

আপনি যখন হালাব করেন জয়
সেখানে তখন খুশির জোয়ার বয়।
সে আপনার হাতে নিজেকে সঁপে দেয়
শাসনাধিকার প্রয়োগ করুন, থাকুন নির্ভয়।

---

[১৫] সিনজির বর্তমান সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের একটা গ্রামের নাম। -সম্পাদক

হালাবের মর্যাদার প্রশংসায় আবু তাইয়ি নাজ্জার বলেন:

হালাব হলো শামের রাজা, ইউসুফ তার বাড়ালেন জৌলুস
যে-ই একে জয় করে তারই ঝরে যায় সব কলুষ।
যে-ই এখানে বাস করেছে সে-ই পেয়েছে সম্মান গভীর-অতল
যে-ই একে শাসন করেছে সে-ই শাসন করেছে পর্বত-সমতল।

এই পর্যায়ে সালাহউদ্দীন তিনটি ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেন- ইসমা'ঈলীদের, ফ্র্যাংকদের এবং নূরুদ্দীনের রাজকুমারদের। ইরাক, শাম ও মিশরে ইসলামের ঐক্য বাধাগ্রস্ত করতে এই তিনটি শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু প্রজ্ঞা, ক্ষমতা ও দৃঢ়তা দিয়ে সালাহউদ্দীন তাদের উপর বিজয়ী হন।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো এই বীর কীভাবে ইসলামী ভূমিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদী চেতনা প্রজ্জ্বলিত করেন।

অধ্যায় পাঁচ

সালাহউদ্দীনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম ভূখণ্ড

১.

সুলতান নূরুদ্দীনের মৃত্যুর পর বীর সালাহউদ্দীনের সামনে নিজের পতাকার অধীনে সব মুসলিম ভূখণ্ডকে একত্র করার সকল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। নিজের সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতা খাটিয়ে তিনি একের পর এক ভূখণ্ড ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন। এ সময় ইয়েমেনের বিভিন্ন দল একে অপরের সাথে সারাক্ষণ সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলো। ফলে এই দেশটির একেবারে ছিন্নভিন্ন অবস্থা হয়ে যায়। সানার হামাদানি গোষ্ঠী ও যুবাইদের নাজাহি গোষ্ঠী একে অপরের সাথে যুদ্ধরত থাকতো। এরই মাঝে এক ভণ্ড আবার নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করে বসে। তার কারণে ইয়েমেনে অনেক প্রাণহানি ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটে। সালাহউদ্দীন মুসলিমদের এই অন্তর্কলহ দেখে খুবই ব্যথিত হন। তিনি তাঁর ভাই তুরান শাহকে ইয়েমেন অভিযানে পাঠান। তিনি সাফল্যের সাথে এসকল বিশৃঙ্খলা দূর করে ইয়েমেনকে মিশর ও শামের সাথে যুক্ত করেন।

২.

তুরান শাহ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে নীলনদ পার করে কুস পর্যন্ত যান। তারপর তিনি স্থলপথে লোহিত সাগরের উপকূল পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে জেদ্দাহ ও ইয়েমেনে নৌযাত্রা করেন। তিনি যুবাইদ অঞ্চল ও আরো কিছু ঘাঁটি দখলে সমর্থ হন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বলেন তিনি ইয়েমেনে আশিটিরও বেশি ঘাঁটি, দূর্গ ও শহর দখল করেন। প্রতীয়মান হয় যে, ইয়েমেনবাসীরা তুরান শাহ'র আগমনে খুশিই হয়েছিলো। কারণ তিনি সেখানে বিরাজমান অস্থিতিশীলতা দূর করার জন্যই গিয়েছিলেন। ইয়েমেনিদের অনেকেই তুরান শাহ'র জন্য পথ করে দেয়। অনেক জায়গায় রক্তপাত এড়াতে দূর্গরক্ষীরা বিনা বাধায় তাঁর হাতে দূর্গের চাবি তুলে দেয়। তারা সবাই শান্তি চাইছিলো। ইয়েমেন জয় করার পর উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে তুরান শাহ তাইজ শহরকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন।

৩.

সালাহউদ্দীন তুরান শাহকে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করেন। তাঁর পরে তাগতাকিন ইবনু আইয়ুব এ অঞ্চলের শাসক হন। ইয়েমেনে আইয়ুবী শাসন স্থায়ী হয় প্রায় আশি বছর, ৫৬৯ থেকে ৬৫২ হিজরি।

৪.

ইয়েমেন জয় করার একই বছরেই, অর্থাৎ ৫৬৯ হিজরিতে সালাহউদ্দীন বারকাহ, ত্রিপোলি এবং তিউনিসিয়ার পূর্ব অংশ থেকে কাবিস পর্যন্ত জয় করেন।

৫.

৫৭৯ হিজরিতে মুসলিম প্রতিনিধি ও রাজকুমারদের নিয়ে দামেস্কে আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য ভাই আল-মালিক আল-‘আদিলকে আহ্বান জানান সালাহউদ্দীন। এই সম্মেলনে উপস্থিত হন মহান শাইখ সাদরুদ্দীন, আব্বাসি খলিফা আন-নাসর লিদ্বীনিল্লাহ’র প্রতিনিধি শিহাবুদ্দীন বাশর, আল-ক্বাদি মহিউদ্দীন আশ-শাহরানযুরি, মসুল শাসকের প্রতিনিধি বাহাউদ্দীন ইবনু শাদ্দাদ, আল-জাযিরাহ’র শাসকের প্রতিনিধি মু’ইযুদ্দীন সিনজার সহ আরো অনেকে। মুসলিম নেতাদের মধ্য থেকে সালাহউদ্দীন সকল মতভেদ ও ঝগড়া-বিবাদ দূর করতে সচেষ্ট হন। মসুল শাসকের প্রতিনিধি ছাড়া বাকি সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে রাজি হন। একমাত্র তিনিই সালাহউদ্দীনের বিরোধিতা করেন।

৬.

মসুলের শাসক মুসলিম বিশ্বের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে অসম্মত হলে তাঁকে সঠিক পথে আনার জন্য সালাহউদ্দীন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। সালাহউদ্দীন শহরটিতে অবরোধ আরোপ করলে এর শাসক ‘ইযযুদ্দীন আত্মসমর্পণ করে ৫৮১ হিজরি সনে হাররান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী ‘ইযযুদ্দীন শাহার যুর, আল-কারাবিলি ও তাজফাক শহর এবং এর সংলগ্ন প্রদেশগুলো সালাহউদ্দীনের

হাতে তুলে দেন। পক্ষান্তরে, সালাহউদ্দীন তাঁকে এই শর্তে মসুলের কর্তৃত্ব দেন যে, জুমু'আর খুতবা ও মুদ্রা হবে সালাহউদ্দীনের নামে। সেই সাথে 'ইযযুদ্দীন সালাহউদ্দীনের নীতিমালা অনুসরণ করতেও বাধ্য থাকবেন।

মাফরাজুল কুলুব ফি তাওয়ারিখ বানি আইয়ুব গ্রন্থের লেখক ইবনু ওয়াসিল বলেন, হাররান চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে মসুল, সিনজির, আল-জাযিরাহ, আরবিল, হাররান, দিয়ার বাকর ও অন্যান্য স্থানের শতধা বিভক্ত সৈন্যদেরকে সালাহউদ্দীন এক পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ করেন।

৭.

বাগদাদের আব্বাসি খলিফা আল-মুস্তাদি'র কাছে সালাহউদ্দীন একটি বার্তা পাঠান। সালাহউদ্দীনের উজির আল-কাদি আল-ফাদল সেই চিঠিতে সালাহউদ্দীনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর জিহাদ ও বিভিন্ন অর্জন, যেমন শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই, মিশর, ইয়েমেন ও উত্তর আফ্রিকা জয়, এবং আব্বাসি খলিফার নামে খুতবা পাঠের প্রচলন। সেই সাথে তিনি অনুরোধ করেন যেন সালাহউদ্দীনকে মিশর, মরক্কো, ইয়েমেন, সিরিয়া ও তাঁর বিজিত অন্যান্য শহরের উপর শাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া তাঁর পরে যেন তাঁর ভাই বা পুত্র তাঁর উত্তরাধিকারী হন। খলিফা আল-মুস্তাদি' তাতে সাড়া দেন এবং তিনি কোন কোন অঞ্চল শাসন করতে চান তা জানানোর জন্য প্রতিনিধি দল পাঠান। এছাড়া তিনি প্রতিনিধি দল ও সুলতানের আত্মীয়দের জন্য উপহার সামগ্রী ও সম্মানসূচক জোব্বা পাঠান।

৮.

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেলো যে, সালাহউদ্দীন প্রচুর এলাকাকে এক পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ করেন। রামাল্লা থেকে নীল অববাহিকা, উত্তর আফ্রিকা থেকে ত্রিপোলি পর্যন্ত অনেক শহর তিনি শাসন করেন। এছাড়া তিনি মিশর, শাম ও উত্তর ইরাকের পাশাপাশি ইয়েমেন, এডেন, ত্রিপোলি উপকূল এবং তিউনিসিয়ার একটি অংশ থেকে কাবিস পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। তাঁর শাসনাধীন এলাকাগুলোতে তাঁর নামে জুমু'আর খুতবা পড়া হতো। তাঁর

শাসনাধীন এলাকাগুলো হলো উত্তর ইরাক (কুর্দিস্তান), শাম, ইয়েমেন, মিশর, মরক্কো, এবং উত্তর আফ্রিকা উপকূল।

নিঃসন্দেহে মুসলিমদের আশা-ভরসার স্থল ছিলেন সালাহউদ্দীন। জনগণ তাঁর মাঝে মুসলিমদের ঐক্য গড়ার ও ক্রুসেডারদেরকে চূড়ান্ত আক্রমণ করে জেরুসালেম মুক্ত করে ঐতিহাসিক গৌরব ছিনিয়ে আনার অপার সম্ভাবনা দেখতে পায়।

৯.

মুসলিম উম্মাহ অযোগ্য শাসকদের যুলুমের অনেক ভুক্তভোগী ছিলো। সালাহউদ্দীনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে কবিদের দল মুসলিম ও ইসলামের গৌরব হিসেবে বর্ণনা করে। ইবনু সানান এক কবিতায় বলেন:

শাসক তো নয় যেন আলসের ধাড়ি
সবগুলোর আচরণ শিশুদের মতো।
সালাহউদ্দীন আসামাত্রই দূর হলো আঁধার
সেরে গেলো নিমেষে রোগ-শোক যত।

তারা আরো বিশ্বাস করতো যে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য হলো জেরুজালেমকে ক্রুসেডারদের নোংরা থাবা থেকে মুক্ত করার সূচনা মাত্র। আর জেরুজালেম বিজয় হবে সমগ্র ফিলিস্তিন বিজয়ের পথে আরেকটি ধাপ। সালাহউদ্দীনের প্রশংসায় আল-'ইমাদ আল-আসবাহানি বলেন,

তুমি জিতলেই ইসলাম জিতে যায়
দ্বীন-দুনিয়ার শক্তি ও আশা বেড়ে যায়।
থামিও না রথ, জেরুজালেমও জিতে নিয়ে এসো
ইসলামের এক সৈনিক হয়ে মর্যাদার আসনে বসো।

অধ্যায় ছয়

ক্রুসেডারদের চক্রান্ত ও যুদ্ধ

ক্রুসেড কী

ক্রুসেড হলো প্রায় দুই শতকব্যাপী ইউরোপ কর্তৃক পরিচালিত সামরিক অভিযান। এর উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিমদের হাত থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে নেওয়া এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের বিজয় রথের গতিরোধ করা।[১৬]

ক্রুসেডের কারণ

ক্রুসেডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হলো:

১.

জেরুজালেম এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের যেসব এলাকা খ্রিষ্টান শাসনাধীনে ছিলো, তা মুসলিমরা জয় করে ফেলায় খ্রিষ্টানদের মাঝে ঘৃণার আগুন জ্বলে ওঠে।

২.

মুসলিম সেলজুকরা কন্সটান্টিনোপলের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলো। মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান বিশ্বের সাহায্যের আবেদন করেন বাইজেন্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনাস।

---

[১৬] এই অধ্যায়ের বেশীরভাগ অংশ নেওয়া হয়েছে মুহাম্মাদ আল আরুসির লেখা 'আল হুরুব আস-সালিবিয়্যাহ ফি-মাশরিক ওয়াল মাগরিব' কিতাব থেকে।

৩.

জেরুজালেমের খৃষ্টান তীর্থযাত্রীরা মুসলিমদের পক্ষ থেকে খারাপ আচরণের অভিযোগ তোলে। ইউরোপে ফিরে তারা অভিযোগ করে যে মুসলিমদের কাছ থেকে তারা অনেক অবিচার ও হয়রানির শিকার হয়েছে। এভাবে খ্রিষ্টানদের মনে মুসলিমদের ব্যাপারে ঘৃণার বীজ বপনে সবচেয়ে তৎপরদের একজন ছিলেন ফ্রেঞ্চ সন্ন্যাসী পিটার দ্য হার্মিট।

৪.

জেরুজালেমকে মুসলিমদের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে পাপমোচন করানোর ধর্মীয় চেতনা ছিলো ক্রুসেডারদের বড় এক উৎসাহের উৎস। যাজক, বিশপ ও পোপদের ভাষণে তা আরো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

৫।

সেলজুক মুসলিমদের দখলকৃত এলাকাগুলো মুক্ত করতে মিশরের ফাতিমিরা বাইজেন্টাইনদের সাথে মৈত্রী করতে খুবই উৎসুক ছিলো।

ফ্রান্সে কাউন্সিল অব ক্লারমন্টে পোপ দ্বিতীয় আরবান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ৪৮৮ হিজরি মোতাবেক ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করতে সম্মত হয়। সেই ভাষণে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘৃণা প্রকাশিত হয়। তিনি ঘোষণা করেন, "এই যুদ্ধ কেবল একটি শহর জয় করার যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধ হলো সমগ্র এশিয়া জয় করে এর অপরিমেয় সম্পদ হস্তগত করা। আপনাদেরকে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রায় গিয়ে একে দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। আপনাদেরকে এই ভূমি জয় করতেই হবে। কারণ তাওরাত ঘোষণা করেছে যে, এটি হলো প্রবহমান দুধ ও মধুতে ভরা শহর।"[১৭]

[১৭] আল আকবর আস-সুন্নিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১২

প্রথম ক্রুসেড ও জেরুজালেম দখল

৪৮৬ হিজরিতে ফ্রেঞ্চ সন্ন্যাসী পিটার দ্য হার্মিট জেরুজালেম সফর করেন। দেশে ফিরে তিনি পোপের সাথে দেখা করে ক্রুসেডের ডাক দেওয়ার আহ্বান জানান। পোপ প্রথমে উত্তর ইটালির পিয়াকেজানে একটি সম্মেলন করেন। তারপরে ফ্রান্সে কাউন্সিল অব ক্লারমন্টের সম্মেলন হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় যুদ্ধ শুরু করার।

ক্রুসেডার সেনাবাহিনীগুলো কন্সটান্টিনোপলে মিলিত হওয়ার পরিকল্পনা করে। প্রথম বাহিনীটি ছিলো খুবই বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো। এটি এশিয়া মাইনর পার হওয়ার পর সেলজুক কালিজ আরসালান তাদেরকে কন্সটান্টিনোপলের খুব কাছে নাইকিয়া শহরে মোকাবেলা করে পরাজিত করেন।

রাজা ও সামন্তপ্রভুদের নেতৃত্বে অন্যান্য বাহিনীগুলো অগ্রসর হয় দক্ষিণ ও উত্তর ফ্রান্স (তাই তাদেরকে ফ্র্যাংক বলা হতো) এবং দক্ষিণ ইতালির দিক থেকে। তারা কন্সটান্টিনোপলে জড়ো হয়। এই বাহিনী এশিয়া মাইনর পার হলে কালিজ আরসালান তাদেরকে বাধা দেন। ফলে দুই পক্ষে ব্যাপক সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ক্রুসেডাররা তাঁকে পরাজিত করে আট মাস অবরোধ করে রাখার পর এন্টাকিয়া[১৮] দখল করে। এরপর ৪৯২ হিজরিতে (১০৯৯ ঈসায়ী) এক মাস অবরোধ করে রাখার পর জেরুসালেম তাদের হস্তগত হয়। সেখানে তারা তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন এবং মানবতার সব নিয়ম নীতির বাইরে গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবরকম বর্বরতা প্রদর্শন করে। তারা প্রায় সত্তর হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। আল-আকসা মাসজিদ ও এর সংলগ্ন রাস্তাগুলো মুসলিমদের রক্তে ভেসে গিয়েছিলো।

[১৮] সেসময় এই শহরের নাম ছিলো অ্যান্তিও। কিন্তু এটার বর্তমান নাম এন্টাকিয়া যা তুরস্কের হাতায় প্রদেশে অবস্থিত।– সম্পাদক

মুসলিমদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে ইবনুল আসির লিখেন:

> “জনগণ রমযান মাসে আল-কাদি আবু সা’ইদ আল-হারওয়ি’র সাথে শাম থেকে বাগদাদে পালিয়ে যায়। তিনি ক্রুসেডারদের এমন সব ভয়ানক কর্মকাণ্ড ও অপরাধের বর্ণনা দেন যাতে কারো চোখ শুষ্ক থাকতে পারে না, হৃদয় স্থির হতে পারে না। তারা জুমু’আর সালাত পড়ে মুসলিমদের হত্যা, নারী-শিশুদের উপর নির্যাতন ও সম্পদ লুটপাটের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে দু’আ আর কান্নাকাটি করে সাহায্য চায়। এই পরিস্থিতিতেই তারা সেদিনের ইফতার করে।”

এই যুদ্ধের ফলে ক্রুসেডাররা শামে আস্তানা গেড়ে বসে। আলেক্সান্দ্রিয়া উপসাগর থেকে আশকেলন এবং ‘আকাবা উপসাগর থেকে আর-রুহা’র (বর্তমানে তুরস্কের উরুফা)[১৯] উত্তর দিক পর্যন্ত উপকূলগুলোতে অসংখ্য ঘাঁটি গড়ে তোলে।

ক্রুসেডারদের বিজয়ের কারণ

ক্রুসেডারদের বিজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হলো জেরুজালেম ও এর আশপাশের এলাকার মুসলিমদের মধ্যকার হাজারো অন্তর্কলহ এবং মতপার্থক্য। জেরুজালেম হলো সেই ভূমি যেখান থেকে রাসূলুল্লাহকে ﷺ মি’রাজে নেওয়া হয়। এই ভূমিতে ক্রুসেডাররা নিজ যোগ্যতায় কখনো মুসলিমদের উপর চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। মুসলিম উম্মাহ’র মধ্যকার বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদ লক্ষ করেই তারা এই দুর্বল জায়গায় আঘাত করে। এভাবেই সুযোগ বুঝে মুসলিম বিশ্বে হামলে পড়ে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করে এবং সম্মানিত এক জাতিকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে।

এ কারণেই প্রথম ক্রুসেডের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইতিহাসবিদগণ সেসময় মুসলিম সমাজের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে থাকেন। যেমন

[১৯] উরফা বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত, যার অফিসিয়াল নাম সানলিউরফা। প্রাচীনকালে এর নাম ছিলো এডেসা।– সম্পাদক

* ক্রুসেডাররা যখন জেরুসালেম অবরোধ করে রেখেছিলো, মুহাম্মাদ ইবনু মালিকশাহ[২০] তাঁর সৎভাই বারকিয়ারুকের সাথে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

* শামের রাজারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকা অবস্থায় ফ্র্যাংকরা অ্যাকর[২১] অঞ্চল দখল করে নেয়।

* মুসলিম দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতো। কিছু মুসলিম দেশ অপর মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে ফ্র্যাংকদের সাহায্য চাইতো।

ইবনুল আসির সহ অনেক ইতিহাসবিদই এই কারণগুলো আলোচনা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় মুসলিম উম্মাহ্ নিজেই নিজের পরাজয়ের জন্য দায়ী ছিলো। আল্লাহ তাদের উপর কোনো যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

দ্বিতীয় ক্রুসেড: হাত্তিনে বিজয়ের পূর্বাভাস

আগেই বলা হয়েছে যে মুসলিম ঐক্যের অবক্ষয়ই ছিলো ক্রুসেডারদের জেরুজালেম দখলে সাফল্যের প্রধান কারণ। একটি বিপ্লবী ঐক্য গড়ে তুলতে না পারলে ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করা তাই অসম্ভব হয়ে গিয়েছিলো। এই বিপ্লবের একটি আভাস পাওয়া যায় যখন ৫২১ হিজরিতে 'ইমাদুদ্দীন যাঙ্কি মসুল থেকে মা'আররাত আন-নু'মান[২২] পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। 'ইমাদুদ্দীন অসংখ্যবার ক্রুসেডারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এর মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিলো আর-রাহা-তে ৫৩৯ হিজরিতে

---

[২০] মুহাম্মাদ ইবনে মালিক শাহ ১০৭২-১০৯২ সাল পর্যন্ত তুর্কি সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান ছিলেন।– সম্পাদক

[২১] এর আরবী নাম عكا, ইংরেজীতে acre, ako ইত্যাদি নামে পরিচিত হলেও সাধারণত এটা akko হিসেবে উচ্চারিত হয়। বর্তমান এটি ইসরায়েলে অবস্থিত।– সম্পাদক

[২২] মা'আররাত আল নু'মান সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশে অবস্থিত। -সম্পাদক

সংঘটিত সংঘর্ষ। যুদ্ধে পরাজিত হলে এই অঞ্চল থেকে ক্রুসেডারদের প্রভাব দুর্বল হয়ে যায়।

এইসব পরাজয়ের কারণে ক্রুসেডাররা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডের পরিকল্পনা করে। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম লুই এবং জার্মান সম্রাট তৃতীয় কনরাড অংশ নেন।

তাঁরা 'ইমাদুদ্দীন মাহমুদকে[২৩] হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। তিনি তাঁর পিতা 'ইমাদুদ্দীন যাঙ্কির মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যের পশ্চিমাংশ শাসন করেন। তাঁকে প্রধান লক্ষ্যবস্তু বানানোর কারণ হলো তাঁকেই তারা ফ্র্যাংকদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করতো। ক্রুসেডাররা শামের দিকে অগ্রসর হয়ে অল্প সময়ের জন্য তা অবরোধ করে হাল ছেড়ে দেয়। ৫৪৩ হিজরিতে অবরোধ তুলে ফেলা হয়। এভাবেই দ্বিতীয় ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটে। ক্রুসেডারদের ব্যর্থতা মুসলিমদেরকে উজ্জীবিত করে তোলে যা পরবর্তীকালে হাত্তিনের বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[২৩] ইমাদুদ্দীন যাঙ্কির বেশ কয়েকজন ছেলে ছিলো। তাদের মধ্যে বড় দুইজন ছিলেন সাইফুদ্দীন এবং নুরুদ্দীন মাহমুদ। এই দুই ভাই বাবার রেখে যাওয়া সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন। সাইফুদ্দীন মসুলকে রাজধানী রেখে পূর্ব দিকের অংশ শাসন করেন এবং নুরুদ্দীন আলেপ্পোকে রাজধানী করে পশ্চিম দিকের দখল নেন। নুরুদ্দীনের শাসনকৃত অংশ ছিলো ক্রুসেডারদের ভূখণ্ডের কাছাকাছি। যে কারণে ক্রুসেডারদের সাথে নুরুদ্দীনের সংঘর্ষ হওয়াটা অনুমিতই ছিলো।– সম্পাদক

অধ্যায় সাত

হাত্তিনের যুদ্ধে সালাহউদ্দীনের বিজয়

যুদ্ধের কারণ

চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সালাহউদ্দীনের বিশাল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলো উত্তর ইরাক (কুর্দিস্তান), শাম, মিশর, ইয়েমেন এবং বারকাহ। তিনি ফ্র্যাংকদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন এবং জেরুজালেমসহ তাদের দখলকৃত অন্যান্য শহরগুলো আক্রমণ করার জন্য একটি সেনাবাহিনীও গড়ে তোলেন। জেরুজালেমের মুসলিম ও আল-আকসা মাসজিদের সাথে ক্রুসেডাররা যে পাশবিক আচরণ করেছে, তার সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য তিনি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

৫৮২ হিজরিতে (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালাহউদ্দীনের অনুগত একটি ব্যবসায়ী কাফেলাকে আক্রমণ করে বসেন কেরাকের রাজা রেজিনাল্ড অব চ্যাটিলন[২৪] (আরবিতে আরনাত)। প্রতিশোধের পালা এবার চলেই আসলো। মিশর ও শামের মাঝে অবস্থিত কেরাক ঘাঁটির সাথে সালাহউদ্দীনের একটি চুক্তি ছিলো। চুক্তির একটি শর্ত ছিলো মিশর ও শামের মাঝে মুসলিমদের ব্যবসায়িক কাফেলার নিরাপদ চলাচল।

রেজিনাল্ড কাফেলার সম্পদ লুট এবং কাফেলার সাথে থাকা লোকদের বন্দী করে। ইতিহাসবিদরা বলেন যে, রেজিনাল্ড ছিলেন প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষী ও রাসূলবিদ্বেষী। তিনি কাফেলার বন্দীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমরা যদি মুহাম্মাদকে বিশ্বাস কর, তাহলে তাকে ডাকো তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য।” সালাহউদ্দীনকে তা জানানো হলে তিনি আক্রোশে ফেটে পড়েন এবং রেজিনাল্ডকে নিজ হাতে হত্যার শপথ নেন। আল্লাহ তাঁর শপথ পূর্ণ করেছিলেন, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখবো ইনশাআল্লাহ।

---

[২৪] ইংরেজীতে Châtillon লেখা হয়। বর্তমান ফ্রান্সে অবস্থিত।– সম্পাদক

রেজিনাল্ডের আক্রমণ সালাহউদ্দীন ও ফ্র্যাংকদের মধ্যকার যুদ্ধের আগুনের প্রথম জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। সালাহউদ্দীন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকে যন্ত্রণা ও কষ্টের স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকেন। সালাহউদ্দীনের বীরত্ব ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার মায়েরা সালাহউদ্দীনের ভয় দেখিয়ে সন্তানদেরকে ঘুম পাড়াতে থাকে। কিন্তু বাস্তবে নারী-শিশু ও বন্দীদের সাথে এই বীরের আচরণ ছিলো কোমল ও নম্র। তিনি ইতিহাসের গৌরব ও পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য আদর্শ।

হাত্তিনের যুদ্ধ ও জেরুজালেম বিজয়

রেজিনাল্ডের ঘৃণ্য আক্রমণের পর সালাহউদ্দীন তাঁর সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন দিকে অভিযানে পাঠাতে থাকেন যাতে ফ্র্যাংকদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায় এবং জেরুজালেমকে মুক্ত করা যায়। জেরুজালেমই তো সেই স্থান যেখান থেকে মুহাম্মাদ ﷺ মি'রাজে গমন করেন এবং যা নবীগণের জন্মস্থান।

সেসময় কেরাকের রাজা হাজ্জ ফেরত মুসলিমদের আক্রমণ করার জন্য এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। সালাহউদ্দীন হাজ্জীদের প্রতিরক্ষায় জিহাদের ডাক দেন। তিনি বসরার কাছে কাসরুস সালামাহ-তে শিবির করেন এবং হাজ্জীরা নিরাপদে ফিরে আসা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। হাজ্জীগণ সালাহউদ্দীনের বিজয়ের জন্য দু'আ করেন এবং চুক্তি ভাঙতে ওস্তাদ কাফিরগুলোর জন্য বদদু'আ করেন। ফ্র্যাংকরা ঘৃণা ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো যা তাদের অন্তরগুলোকে শক্ত করে দিয়েছিলো। অথচ এগুলোর ফলাফল উল্টো তাদেরকেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিলো।

সেনা প্রস্তুত করার পর সালাহউদ্দীন তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে যুদ্ধের উপযুক্ত সময়ের ব্যাপারে মাশোয়ারা করেন। ৫৮৩ হিজরি সনের ১৭ই রবি'উস সানি জুমু'আর পরের সময়কে নির্ধারণ করা হয়। সময় হলো তাকবির দেওয়ার এবং

বিজয়ের জন্য দু'আ করার।[২৫]

সালাহউদ্দীন দামেস্ক ত্যাগ করে রা'স আল-মা' অঞ্চলের দিকে রওনা দেন। এই জায়গাটি সৈন্য জড়ো করার জন্য ব্যবহৃত হতো। তাঁর ছেলে আল-মালিক আল-আফদাল রা'স আল-মা'তে থাকেন এবং তিনি নিজে যান বসরায় আর মুযাফফারুদ্দীন কুবরি যান অ্যাকরে। বসরা থেকে সালাহউদ্দীন কেরাক এবং আশ-শুবকের দিকে যাত্রা করেন। তারপর তিনি টাইবেরিয়াসে ফিরে আসেন। মুসলিম সৈনিকদের জিহাদী চেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে সালাহউদ্দীন চেষ্টার কোনো কমতি রাখেননি। তিনি সবসময় উম্মাহর চিন্তায় ব্যথিত থাকতেন। খুব কম খেতেন। তাঁকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, "জেরুজালেম ক্রুসেডারদের হাতে বন্দী। এ অবস্থায় আমি কী করে আমোদ প্রমোদ আর উদরপূর্তি করতে পারি?" ক্রুসেডের সময়ে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর সঙ্গী আল-কাযী বাহাউদ্দীন ইবনু শাদ্দাদ বলেন:

"জেরুজালেমের দখল এতই গুরুতর বিষয় ছিলো যে, পাহাড়ও তার ভার বইতে অক্ষম তাঁকে (সালাহউদ্দীন) মনে হচ্ছিলো এমন এক মা, যার কাছ থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে জিহাদের বাণী ছড়িয়ে দিতেন আর চিৎকার করতেন, "হায় ইসলাম! হায় ইসলাম!" তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। তিনি অ্যাকরের লোকদের দুর্দশা যতই দেখতেন, ততই আরো জিহাদের ডাক দিতেন। তিনি ডাক্তারদের দেওয়া ঔষধ ছাড়া আর তেমন কোনো খাবারই খেতেন না। ডাক্তাররা আমাকে জানালেন যে, তিনি জুমু'আর দিন থেকে রবিবার পর্যন্ত বলতে গেলে কিছুই খাননি। কারণ সেসময় তিনি যুদ্ধ নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন।"

ক্রুসেডাররা যখন সালাহউদ্দীনের বিশাল কর্মযজ্ঞের খবর পেলো, তখন তারা প্রস্তুতি নিয়ে টাইবেরিয়াসের দিকে অগ্রসর হলো। হাত্তিন নামক একটি জায়গায়

---

[২৫] আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং বিজয় অর্জিত হওয়া শুধুমাত্র দু'আ করার মাধ্যমে হয়ে যাবে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। আল্লাহর কাছে দু'আ এবং সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা হবে নিজেদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিশ্চিত করে ময়দানে সমাবেত হওয়ার পর। সালাহউদ্দীন আমাদের খুলাফায়ে রাশিদা এবং প্রিয় নবীর সুন্নাতই অনুসরণ করেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বদর, উহুদ, আহযাব, হুনাইনের যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, তোমার প্রতিশ্রুত বিজয় পাঠাও। যদি মুসলিমদের এই বাহিনী আজ এখানে পরাজিত হয়ে যায় তবে এই জমিনে তোমার ইবাদাত করার মত যে আর কেউ রইবে না।'

উভয় পক্ষের সংঘর্ষ হয়। সকালের সূর্য ছিলো আগুনের মতো গরম। মুসলিমরা ক্রুসেডারদেরকে তৃষ্ণায় কাতর করে ফেলার উদ্দেশ্যে পানির উৎসগুলো দখল করে ফেলেন। বীর সালাহউদ্দীন এই সুযোগে তাদের আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেন। ভীত, তৃষ্ণার্ত ক্রুসেডার সেনারা হাত্তিনের কিনারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ যুদ্ধের ফলাফল ছিলো সালাহউদ্দীনের জন্য এক গৌরবময় বিজয় আর ক্রুসেডারদের জন্য লাঞ্ছনাকর পরাজয়। তাদের কেউই পালাতে পারেনি। তাদের দশ হাজার জন মারা যায় আর প্রচুর সংখ্যক সালাহউদ্দীনের সেনাদের হাতে বন্দী হয়। তিনি অ্যাকরের বিশপকে[২৬] হত্যা করে তাঁর ক্রুশ ছিনিয়ে নেন। এত লাঞ্ছনাকর পরাজয় তারা এর আগে কখনো ভোগ করেনি।

মুসলিমরা অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেন। ক্রুসেডারদের মধ্যে বাকি ছিলো কেবল জেরুজালেমের রাজা এবং দেড়শ মতো ঘোড়সওয়ার। তৃষ্ণা, ভয় আর ক্লান্তির আতিশয্যে তাদের কেউই লড়াই করার মতো অবস্থায় ছিলো না। রাজাসহ সব ঘোড়সওয়ারকে বন্দী করা হয়। যুদ্ধের মূল উস্কানিদাতা রেজিনাল্ডও বন্দী হয়। সুলতান সালাহউদ্দীন এক তাঁবুতে বিজ্ঞ উপদেষ্টাদের সাথে সলা-পরামর্শ করেন। বিজয়ের শোকরানা স্বরূপ তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন।

তারপর রাজা গায় অব লুসিগ্নান ও কেরাক সম্রাট রেজিনাল্ডকে সালাহউদ্দীনের তাঁবুতে আনা হয়। সালাহউদ্দীন তাঁদের জন্য পানি আনার নির্দেশ দেন। পেয়ালার বেশিরভাগ পানি রাজা একাই সাবাড় করে বাকিটা রেজিনাল্ডকে দেন। সুলতান বললেন, "আমরা তার প্রাণ বাঁচাতে পানি দিইনি।" তিনি রেজিনাল্ডকে মুসলিমদের কাফেলা আক্রমণ ও রাসূলুল্লাহকে ﷺ গালিগালাজ করার অপরাধে তিরস্কার করেন। পূর্বের শপথ অনুযায়ী তিনি রেজিনাল্ডকে হত্যা করেন। তা দেখে রাজা ভীত হয়ে পড়েন। সালাহউদ্দীন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "একজন রাজার জন্য অপর রাজাকে হত্যা করা শোভনীয় নয়। কিন্তু এই লোক সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।" রাজা ও তাঁর অনুসারীদেরকে তিনি সসম্মানে দামেস্কে পাঠিয়ে দেন।

এই যুদ্ধে সালাহউদ্দীন আর ক্রুসেডারদের মধ্যে একটি এসপার-ওসপার

---

[২৬] সেসময় বিশপরাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে এবং যুদ্ধের উস্কানি দেওয়ার নাটের গুরু হিসেবে কাজ করতো। তারা এটাকে পবিত্র যুদ্ধ বলে প্রচার করতো এবং অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতো।– সম্পাদক

ফায়সালা হয়ে যায়। সুসজ্জিত, সুসংগঠিত, দক্ষ ও সুনিপুণ নেতৃত্বসম্পন্ন মুসলিম বাহিনীর হাতে ফ্র্যাংকদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। সামরিক প্রজ্ঞা খাটিয়ে মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়েছিলো।

এই বিজয়ের পর সালাহউদ্দীন অ্যাকর পোতাশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হন। ৫৮৩ হিজরিতে সেখানকার সবাই আত্মসমর্পণ করে। ক্রুসেডাররা সে জায়গা ছেড়ে টায়ারে[২৭] চলে যায়। অ্যাকরের আশেপাশে আরো অনেক শহর-দূর্গ দখল করেন সালাহউদ্দীন। যেমন- তাবনাইন, সিডন, জুবাইল এবং বৈরুত। তারপর তিনি আশকেলনের উপকূল চৌদ্দ দিন অবরোধ করে রাখার পর তারা আত্মসমর্পণ করে। এরপর তিনি জেরুজালেম অবরোধ করে রেখে উপকূল থেকে ক্রুসেডারদের কাছে রসদের সাপ্লাই আটকে দেন। রামাল্লা, আদ-দারুম, বেথেলহেম ও আন-নাতরুন দখল করার পর তিনি জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হন।

এ সময় আল-আকসা মাসজিদের পক্ষ থেকে সালহউদ্দীনকে আহ্বান করে জেরুজালেমের এক বন্দী মুসলিম কবিতা লিখে পাঠান:

হে ক্রুশ ধ্বংসকারী বাদশাহ!

এখনো আঁধারেই আছে জেরুজালেম!

সব মাসজিদ পবিত্র হয়ে গেছে,

শুধু আমিই নাপাক রয়ে গেলেম।

সালাহউদ্দীন আল-আকসার নিরাপত্তা চাইছিলেন। তাই তিনি বলপ্রয়োগ করার চেয়ে সন্ধির মাধ্যমেই জেরুজালেমে প্রবেশ করতে চাইলেন। নতুবা আল-আকসার পবিত্রতা লঙ্ঘন ও ঘরবাড়ি ধ্বংসের আশংকা রয়ে যায়। এভাবে তিনি 'উমার বিন খাত্তাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) জেরুজালেম বিজয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। তিনি দূত মারফত তাদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে জানালেন, "আমিও আপনাদের মতো জেরুজালেমের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি। আমি এই পবিত্র স্থানটিকে আক্রমণ বা অবরোধ করতে চাই না।" কিন্তু ফ্র্যাংকরা আত্মসমর্পণ না করে গোঁ ধরে বসে রইলো। সালাহউদ্দীন এবার আক্রমণাত্মক

---

[২৭] আরবী নাম صور, লেবাননের দক্ষিণ প্রদেশে অবস্থিত। -সম্পাদক

অবস্থানে যেতে বাধ্য হলেন। এক সপ্তাহ যাবত অবরোধ করে রাখার পর ফ্র্যাংকরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়। সালাহউদ্দীন তাদেরকে শর্ত দেন যে, চল্লিশ দিনের মধ্যে তাদের সবাইকে এই ভূমি ছেড়ে চলে যেতে হবে। মুক্তিপণ হিসেবে প্রত্যেক পুরুষ দশ দিনার, প্রত্যেক নারী পাঁচ দিনার, আর অপ্রাপ্তবয়স্করা দুই দিনার করে পরিশোধ করবে। যাদের পক্ষ থেকে মুক্তিপণ পরিশোধ করা হবে না, তাদেরকে বন্দী করে রাখা হবে।

সালাহউদ্দীন জেরুসালেম জয় করার পর কবি জুবাইর লিখেন:

জেরুসালেম জয় হয়েছে দুইবারে দুই দিন,
একটি করেন উমার ফারুক, আরেকটি সালাহউদ্দীন।

ক্রুসেডাররা সালাহউদ্দীনের নিযুক্ত লোকদের কাছে মুক্তিপণ পরিশোধ করে ৫৮৩ হিজরি সনের ২৭শে রজব জেরুজালেম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে চলে যায়। ঐতিহাসিকদের প্রসিদ্ধ মত হলো, এই তারিখেই রাসূলুল্লাহর ﷺ মি'রাজ সংঘটিত হয়।

আল-কাদি মুহিউদ্দীন ইবনুযযাকি'র লেখা সেই কবিতা যেন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো:

সফর মাসে আপনার তলোয়ারে হালাব বিজয়
যেন রজবে জেরুসালেম বিজয়ের লক্ষণ হয়।

পুনঃমুক্ত জেরুজালেমের মাসজিদুল আকসায় প্রথম জুমু'আর খুতবা দিতে মুহিউদ্দীনকে ডেকে আনেন সালাহউদ্দীন। বিপুল সংখ্যক মুসল্লি ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে এই জুমু'আয় অংশ নেন। এই খুতবা *আর-রাওদাতাইন* কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। এর কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

"হে জনগণ! মহান আল্লাহর রহমতে আপনাদের কাছে সুসংবাদ এসে পৌঁছেছে। প্রায় একশ বছর মুশরিকদের নাপাক হাতে থাকার পর এই বহুল আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে (জেরুজালেম) আল্লাহ আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই ঘর (মাসজিদুল আকসা) যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ

করা হয়, তাকে আপনাদের হাত দিয়ে পাক-পবিত্র করিয়েছেন। তিনি আপনাদেরকে তাওফিক দিয়েছেন শিরকের সব চিহ্ন ও ছবি এখান থেকে মুছে ফেলার। আর তাওহীদের যেই ভিত ও তাকওয়ার খুঁটির উপর এই মাসজিদ নির্মিত হয়েছিলো, তাতে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এই স্থান আপনাদের পিতা ইব্রাহীমের ('আলাইহিসসালাম) বাসভূমি, নবীজী মুহাম্মাদের ﷺ মি'রাজে আরোহণের স্থান, আপনাদের প্রথম কিবলা, নবী-রাসূলগণের ('আলাইহিমুসসালাম) ঘাঁটি এবং মুত্তাকীগণের গন্তব্য। (পূর্ববর্তী নবীগণের সময়ে) ইসলামের শৈশবে এখানেই হালাল-হারামের বিধান নিয়ে ওয়াহী নাযিল হয়েছে, এটি সেই স্থান যেখানে কিয়ামাতের দিন মানুষেরা দাঁড়াবে, আর এটি কুর'আনে উল্লেখিত পবিত্র ভূমি। এই সেই মাসজিদ, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের ইমামতি করেছেন। এই সেই ভূমি যেখানে মারইয়ামের ('আলাইহাসসালাম) গর্ভে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন 'আব্দুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ, রূহুল্লাহ 'ঈসাকে ('আলাইহিসসালাম)। (তিনি ইলাহ ছিলেন না), তিনি তো কেবলই আল্লাহর বান্দা।

আল্লাহ বলেন:

"মাসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না।"[২৮]

আল্লাহ আরও বলেন:

"অবশ্যই তারা কুফরি করেছে যারা বলে মারইয়ামের ছেলে মাসীহ হলেন আল্লাহ।"[২৯]

এটি প্রথম কিবলাহ, (মক্কার) মাসজিদুল হারামের পর নির্মিত পৃথিবীর দ্বিতীয় মাসজিদ, এবং মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববির পর আল্লাহর কাছে তৃতীয় সর্বোচ্চ সম্মানিত মাসজিদ। মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববি ব্যতীত এটিই একমাত্র মাসজিদ যেখানে সালাত পড়ার উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয।

[২৮] সূরাহ আন-নিসা ৪:১৭২
[২৯] সূরাহ আল-মা'ইদাহ ৫:১৭

এটি চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান। আল্লাহ যদি আপনাদেরকে অন্যদের উপর নির্বাচিত না করে থাকতেন, তাহলে এই বিরল সম্মানে আপনারা কখনোই ভূষিত হতে পারতেন না। আল্লাহ আপনাদেরকে রহম করেছেন আর আপনাদেরকে দিয়েছেন এমন এক বাহিনী, যা মুহাম্মাদের ﷺ বদরের বাহিনীর মতো কারামাত দেখিয়েছে, আবু বকরের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) মতো দৃঢ়তা দেখিয়েছে, 'উমারের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) মতো জয় করেছে, 'উসমানের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) বাহিনীর মতো লড়াই করেছে, আর 'আলীর (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) মতো বীরত্ব দেখিয়েছে। আপনারা কাদিসিয়া, ইয়ারমুক ও খাইবারের যুদ্ধগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন, খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) মতো আক্রমণ চালিয়েছেন। আল্লাহ আপনাদের প্রচেষ্টা বরকতময় করুন, আপনাদের রক্তের কুরবানিকে কবুল করুন এবং আপনাদেরকে চির সুখের জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত করুন। আপনাদেরকে এই নি'য়ামাতের কদর করতে হবে এবং তা পাওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে শোকরগুজার হতে হবে।"

এই বিজয়ের পর কবি, লেখক ও কাহিনীকারেরা পঞ্চমুখ হয়ে এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে গদ্যে-পদ্যে বর্ণনা করতে থাকে। কবি আবুল হাসান ইবনু 'আলী বলেন:

এই সুলতানকে আল্লাহ দিয়েছেন আসমানী সেনা,
এই যুদ্ধই প্রমাণ তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে না।
রাসূলের জয়গুলোর মতোই ঠিক এ বিজয়
সম্পদ নয়, হৃদয় দিয়েই এ ঋণ শুধিতে হয়।
ক্রুসেডার সব রাজারা ছিলো প্রবল ক্ষমতাধর,
হঠাৎই তারা বন্দী হয়ে কাঁপছে যে থরথর।
জেরুজালেম আর কত যে ভূমি কেঁদেছে শতক ধরে
মুসলিম সব সুলতানেরা ছিলেন চোখ-কান বন্ধ করে।
সালাহউদ্দীন ঠিকই দিয়েছিলো সাড়া আল্লাহর ইচ্ছায়,
মাযলুমদের আর্তনাদ শুনে দৃঢ় পায়ে ধেয়ে যায়।
মৃত্যু হবে, বন্ধ হবে সবারই আমলনামা,
সালাহউদ্দীনের সাওয়াবে জারিয়া কখনও রবে না থামা।

মিশরে আহলে বাইতের প্রধান মুহাম্মাদ ইবনু আসাদ আল-হালাবি ওরফে আল-জাওয়ানি লিখেন:

জেরুজালেম জয় হয়েছে, ক্রুসেডারদের হয়েছে পরাজয়,
শিকল পরে এসেছে মুসলিম শিবিরে, বিশ্বাসই না হয়!
রোজ হাশরে দাঁড়াবে যেখানে, চলবে বিচারকাজ
সেই শাম আর জেরুজালেম মুক্ত হয়েছে আজ।
'উমারের মতো করে ক্রুসেডারদের হারালো ইউসুফ সিদ্দিক,
'উসমানের মতো করে ইসলামী জ্ঞান ছড়ালো দিগ্বিদিক।
সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের আঘাত হানি,
পূর্ণ করেছে নবীজীর বলা সেই ভবিষ্যৎ বাণী।

ক্রুসেডারদের সাথে সালাহউদ্দীনের আচরণ

জেরুজালেম ত্যাগ করা ও মুক্তিপণ পরিশোধ করার জন্য সালাহউদ্দীন ক্রুসেডারদেরকে কাগজে-কলমে কঠোর কিছু শর্ত দিয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু বাস্তবে সেই যালিম-লুটেরা ক্রুসেডারদের সাথে দয়ালু আচরণ করে ইসলামী সদাচরণের ব্যবহারিক শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। কোনো যিম্মি (মুসলিম শাসনাধীনের অনুগত অমুসলিম) বা সাধারণ জনগণের উপর অন্যায়ভাবে তলোয়ার চালানোর কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না।

সালাহউদ্দীন যখন দেখলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বিশাল বিশাল মালামাল কষ্ট করে বহন করছে, তাঁর তা সহ্য হয়নি। তিনি তাদের জন্য যাতায়াত খরচ ও সওয়ারির ব্যবস্থা করে দেন।

নারীদের প্রতি সালাহউদ্দীন সম্মানসূচক আচরণ করেন। বাইজেন্টাইন

সম্রাটের এক ধনাঢ্য স্ত্রী সেখানে এক আল্লাহর জন্য উপাসনালয় স্থাপন করে সন্ন্যাসজীবন যাপন করতেন। তাঁর প্রচুর অনুসারী ছিলো। সালাহউদ্দীন তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেন। রাণী সিবিল তাঁর অনুসারীদের সহ যাত্রা করার অনুমতি চাইলে সালাহউদ্দীন সে ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর স্বামী নাবলুসে কারাবন্দী ছিলেন। সালাহউদ্দীন তাঁকে স্ত্রীর সাথে সঙ্গ দেওয়ার অনুমতি দেন। সন্তান কোলে অসংখ্য নারী রাণীর পেছন পেছন আসে। তারা তাদের কারাবন্দী পুরুষ অভিভাবকদের ব্যাপারে মিনতি করে বলে, "হে সুলতান! আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমরা চলে যাচ্ছি। আমরা ওই বন্দীদের কারো মা, কারো স্ত্রী, কারো কন্যা। আমরা এই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি আর আমাদের অভিভাবকদের ওই কারাগারের আঁধার প্রকোষ্ঠে ফেলে রেখে যাচ্ছি। আপনি যদি তাদের হত্যা করে ফেলেন, তাহলে তো আমাদের জীবন ধ্বংস হয়ে গেলো। আর আপনি যদি তাদের মুক্তি দিয়ে দেন, তাহলে আমাদেরকে অনুগ্রহ করলেন এবং দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করলেন।"

এ কথায় সালাহউদ্দীন প্রচণ্ড আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি মায়েদের পুত্রদেরকে, স্ত্রীদের স্বামীদেরকে এবং কন্যাদের পিতাদেরকে মুক্ত করে দেন। সেই সাথে বাদ বাকি বন্দীদের সাথে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

স্টিভেনসনের[৩০] বর্ণনামতে, সুলতান বিপুল সংখ্যক মানুষকে মুক্তিপণ ছাড়াই যেতে দেন। আর্নল্ডের সূত্রে পুল[৩১] বর্ণনা করেন যে, বিকলাঙ্গ ও গরীবদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই সুলতান বেরিয়ে যেতে দেন। ধর্মগুরু ও ধনীদেরকে সাধ্যমতো সম্পদ সাথে করে নেওয়ার অনুমতি দেন। তারা যতটুকু বহন করতে পারছিলো না, মুসলিমরা তা বহন করতে সাহায্য করে।

সালাহউদ্দীনের ভাই আল-মালিক আল 'আদিল সাত হাজার বিকলাঙ্গ ও গরীব লোকের পক্ষে মুক্তিপণ মওকুফের সুপারিশ করেন। সালাহউদ্দীন দশ হাজারের জন্য অনুমতি দিয়ে দেন।

---

[৩০] পুরো নাম জোসেফ স্টিভেনসন। সালাহউদ্দীনকে নিয়ে লেখা তার বইয়ের নাম 'De Expugatione Terrae Sanctae per Saladinum: Capture of Jerusalem by Saladin, ১১৮৭'- সম্পাদক

[৩১]. লেন পুল, স্টেনলে লিখিত 'Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem' একটি বিখ্যাত বই। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) সালাহউদ্দীনের জীবনীতে (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড) এই বই থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। -সম্পাদক

হাত্তিনের বিজয়ের পর সালাহউদ্দীন ফ্র্যাংকদের সাথে যে আচরণ করলেন তা তাদের নিজেদের মধ্যকার সংঘর্ষ ও প্রথম ক্রুসেডে মুসলিমদের উপর চালানো তাদের পাশবিকতার সাথে অতুলনীয়।

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ মিলের[৩২] সূত্রে প্রিন্স 'আলী বর্ণনা করেন যে, জেরুজালেম ত্যাগ করে অনেকে আশ্রয়ের সন্ধানে খ্রিষ্টান শাসিত এন্টাকিয়ায় যায়। সেখানকার সম্রাট তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করে তাড়িয়ে দেয়। তারা অবশেষে মুসলিম ভূমিগুলোর দিকে যাত্রা করে এবং মুসলিমরা তাদের অভূতপূর্ব আদর-আপ্যায়ন করে। প্রিন্স 'আলী আরো বলেন:

> "জেরুজালেম ত্যাগ করে তাদের খ্রিষ্টান ভাইদের কাছে আশ্রয় চাওয়ার পর তাদের কেমন শোচনীয় অবস্থা হয়, তা জানা যায় মিশহুদের বর্ণনা থেকে। তারা শামে গিয়ে অনাহার ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। ত্রিপোলিও তাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। এক নারী অভাবের তাড়নায় তার সন্তানকে সাগরে ছুঁড়ে ফেলতে বাধ্য হয় আর এরকম বিপদের সময় এতটুকু এগিয়ে না আসায় খ্রিষ্টানদেরকে লা'নত দিতে থাকে।"

ধনাঢ্য প্যাট্রিয়ার্ক তাঁর বিপুল সম্পদ ও গাট্টিবোঁচকা নিয়ে কেটে পড়েন, অথচ গরীব ক্রুসেডারদের মুক্তিপণের কোনো ব্যবস্থা করলেন না। পুল তাঁকে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক বলে অভিহিত করেন। সালাহউদ্দীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, "আপনি তাঁর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা মুসলিমদের শক্তিবৃদ্ধিতে কাজে লাগালেন না কেন?" তিনি জবাব দেন, "(চুক্তি ভেঙে) তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা (বিপুল সম্পদ লুট) করার চেয়ে (চুক্তির শর্তানুযায়ী) দশটি দিনার নেওয়াই আমার বেশি পছন্দের।" এ ব্যাপারে পুলের মূল্যায়ন, "মুসলিম সুলতান খ্রিষ্টান যাজককে সত্যিকারের নৈতিকতা ও সততার সবক দিয়ে ছাড়লেন।"

প্রথম ক্রুসেডে মুসলিম ও ইসলামের সাথে ক্রুসেডারদের আচরণ, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তবন্যার বর্ণনা তো পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতেই আলোচিত

[৩২] পুরো নাম জেমস মিল। তিনি একাধারে ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং দার্শনিক ছিলেন। 'The History of British India' মিলের লেখা একটি বিখ্যাত বই। -সম্পাদক

হয়েছে। ৪৯২ হিজরি তথা ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাদের হাতে চলা এসব নির্মমতার কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। তারা জেরুসালেমে প্রবেশের পর কী ঘটেছে, তা মিশহুদের বর্ণনা থেকে মিলের সূত্রে বর্ণনা করেন প্রিন্স 'আলী:

> "মুসলিমদেরকে রাস্তাঘাটে ও ঘরের ভেতর হত্যা করা হয়। কেউ কেউ গণহত্যা থেকে বাঁচার জন্য উঁচু দালানের ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যেরা কেল্লা, প্রাসাদ, এমনকি মাসজিদেও লুকিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু খ্রিষ্টানরা খুঁজে খুঁজে তাদেরকে বের করে আনে। পদাতিক ও অশ্বারোহীরা মুসলিমদের লাশের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আশ্রয়সন্ধানী পলাতকদের খুঁজে বেড়ায়।"

মিশহুদের সূত্রে প্রিন্স 'আলী আরো বর্ণনা করেন:

"যেসব মুসলিমদের সম্পদ লুট করার জন্য জীবিত রাখা হয়েছিলো, তাদেরকে পরে হত্যা করা হয়। অন্যদেরকে জীবিত পুড়িয়ে মারা হচ্ছিলো। অনেকে আতংকে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে যায়। অন্যদেরকে লুকানোর জায়গা থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে প্রকাশ্যে অন্যান্য লাশের উপর এনে মারা হয়। যেই স্থানে ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর শত্রুদেরকে ক্ষমা করেছিলেন, তা নারী-শিশুর কান্না ও লাশে ভরপুর হয়ে যায়।"

মিল আরো বলেন, "বিনা অপরাধে নিহতদের প্রতি কোনো দয়া করা হয়নি। সত্তর হাজার নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়।"

সালাহউদ্দীনের মতো করে শত্রুদেরকে ক্ষমা ও দয়া কি আর কোনো বিজয়ী বীর করেছে? ক্রুসেডারদের মতো ভয়াল আচরণ কি সালাহউদ্দীনের মধ্যে আছে? আল্লাহ সেই কবিকে রহম করুন যিনি বলেছেন:

জেরুজালেমে আমাদের শাসন ছড়িয়েছে ন্যায়বিচার,
তোমাদের (ক্রুসেডারদের) শাসনে হয়েছে সেথায় হত্যা-বলাৎকার।
তোমরা করেছো বন্দী হত্যা, আমরা করেছি দয়া,
ফারাক বোঝাতে লাগে না কোনো উপমা নয়া।

আটাশি বছরের ব্যবধানে সাধারণ মুসলিমদের প্রতি ক্রুসেডারদের আচরণ আর সাধারণ ক্রুসেডারদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ ইতিহাসের শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

অ্যাকর অবরোধ ও তৃতীয় ক্রুসেড

আগেই বলা হয়েছে যে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম ও অ্যাকর ছেড়ে মুসলিম সেনাদের তত্ত্বাবধানে লেবাননের টায়ারে চলে যায়। ক্রুসেডাররা শান্তিচুক্তি করেও পরে তা ভঙ্গ করে। তারা টায়ারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সালাহউদ্দীনের সাথে করা সমঝোতা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইউরোপ থেকে আসা মিত্রবাহিনী ও রসদের উপর নির্ভর করে তারা অ্যাকর অবরোধ করে। উভয় পক্ষের অভূতপূর্ব সাহসিকতা ও দৃঢ়তার কারণে দুই বছর স্থায়ী এই অবরোধ ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

৭ই রজব ৫৮৫ হিজরি মোতাবেক ১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডাররা অ্যাকরের দিকে অগ্রসর হয় এবং স্থল ও জলপথে একে অবরোধ দিয়ে রাখে। মুসলিম সেনাবাহিনী পরে এসে ক্রুসেডারদের উপর স্থলপথে অবরোধ বসায়। তাল কিসান নামক এক পাহাড়ে সালাহউদ্দীন শিবির স্থাপন করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে দাঙ্গা ও সম্মুখযুদ্ধ লেগে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হতে থাকে। সালাহউদ্দীন কিছু সৈনিককে তাঁর রাজ্যের সীমান্তে পাঠিয়ে জনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এদিকে জেরুজালেম হাতছাড়া হওয়ার খবরে হতাশ ইউরোপ ক্রুসেডারদের জন্য নতুন উদ্যমে রসদ পাঠায়।

ক্রুসেডাররা অ্যাকর অবরোধ করে রাখার সময় ইউরোপ তৃতীয় ক্রুসেডের প্রস্তুতি নেয়। বিশেষত একের পর এক পরাজয় তাদেরকে অস্থির করে তুলেছিলো। তৃতীয় ক্রুসেডে নেতৃত্বদাতা রাজাদের কারণে এই যুদ্ধ আলাদা গুরুত্ব লাভ করে। তাঁরা হলেন জার্মান সম্রাট ফ্রেডেরিক বারবারোসা, ফ্রেঞ্চ

রাজা ফিলিপ অগাস্টাস এবং ইংলিশ রাজা রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্ট।

জার্মান প্রচেষ্টা

জার্মান সম্রাট এবং তাঁর এক লক্ষ সেনা হাঙ্গেরি হয়ে কন্সটান্টিনোপলের দিকে যাত্রা করে। বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় আইজ্যাক প্রবল ভীত হয়ে পড়েন এবং তাঁদেরকে সাহায্য করতে ও পথ দেখাতে অস্বীকৃতি জানান। দ্বিতীয় আইজ্যাক সালাহউদ্দীনকে জার্মানদের অগসর হওয়ার কথা জানিয়ে দেন এবং তাদেরকে সাহায্য করতে নিজের অস্বীকৃতির কথা জানান। জার্মান বাহিনী এশিয়া মাইনর দিয়ে পার হয়। আর্মেনিয়া পর্বতমালায় অবস্থানকালে সালিফ নদীতে ডুবে সম্রাটের মৃত্যু হয়। ফলে জার্মান বাহিনী ছন্নছাড়া হয়ে যায়। কেউ জার্মানিতে ফিরে যায় আর কেউ সম্রাটের ছেলে ফ্রেডেরিকের নেতৃত্বে জাহাজে করে অ্যাকর ও টায়ারে আসে। পথিমধ্যে ফ্রেডেরিকের মৃত্যু হলেও অল্প কিছু জার্মান সেনা অ্যাকরে পৌঁছায়। পূর্ণশক্তি নিয়ে তারা আসতে পারলে লড়াই ভীষণ জমে উঠতো।

ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজ সেনাবাহিনী

ফ্রেঞ্চ ও ইংলিশ সেনাবাহিনী সিসিলিতে মিলিত হয়। উভয় দলের মতানৈক্যের কারণে তারা সেখানে দীর্ঘসময় অবস্থান করে। এদিকে অ্যাকরে অবস্থানরত ক্রুসেডাররা তাদের অপেক্ষায় থাকে। অবশেষে ক্রুসেডাররা সিসিলি ছেড়ে অ্যাকরের দিকে যাত্রা করে। দশ দিনের ব্যবধানে ইংরেজরাও রওনা দেয়। অ্যাকরের ক্রুসেডাররা ফ্রেঞ্চদের আগমনে বেশ আনন্দিত হয়।

ইংরেজ রাজা রিচার্ডের বাহিনী ঝড়ের কবলে পড়ে বাইজেন্টাইন সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীন সাইপ্রাসে গিয়ে পড়ে। রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্ট বাইজেন্টাইনদের সাথে লড়াই করে সাইপ্রাস দখল করে নেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। সালাহউদ্দীনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া জেরুজালেমের রাজা রিচার্ডের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি অ্যাকরে জাহাজ ভেড়ান।

মুসলিমদের প্রতিরোধযুদ্ধ

ইংরেজরা যোগ দেওয়ার পর যে ক্রুসেডারদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়, তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শত প্রচেষ্টার পরও সালাহউদ্দীন অ্যাকরের মুসলিমদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। অবস্থা বেগতিক হয়ে গেলে অ্যাকরের মুসলিমরা আত্মসমর্পণ করে।

৫৮৭ হিজরি মোতাবেক ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ই জুমাদা আস-সানি শুক্রবার সালাহউদ্দীন তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শে বসেন। আলোচনার বিষয় ছিলো অবরুদ্ধ মুসলিম জনতা, অ্যাকরে ক্রুসেডের দখলদারিত্ব এবং সেখানকার দূর্গে উড়তে থাকা ক্রুসেডীয় পতাকা। মুসলিমরা ছিলো শঙ্কিত আর ক্রুসেডাররা আনন্দিত। আগের মতোই বর্বরতার পুনরাবৃত্তি ঘটে অ্যাকরে। সালাহউদ্দীনের সদারচণের কথা ভুলে গিয়ে সব চুক্তি ভঙ্গ করে ক্রুসেডাররা দখলকৃত এলাকায় মুসলিমদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করতে থাকে। পুলের বর্ণনানুযায়ী, ২৩শে রজব ৫৮৭ হিজরি (১৬ই আগস্ট, ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলিম ও ক্রুসেডার শিবিরের সামনে রাজা রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্ট দুই হাজার সাতশ মুসলিমকে হত্যা করেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, ক্রুসেডারদের নৃশংসতা জানতে আপনারা পুলের বর্ণনা পড়ে দেখুন। তিনি উল্লেখ করেন যে, অ্যাকরে ষাট হাজার মুসলিমকে হত্যা করা হয়। অল্প কিছু ধনীকে বাঁচিয়ে রাখা হয় তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে। যথারীতি এই অপকল্প বিজয়ের পর ক্রুসেডাররা আমোদ-ফূর্তিতে লিপ্ত হয়ে ওঠে। মিশহুদ উল্লেখ করেন যে, লেভান্তে আসার পর থেকে নিয়ে অ্যাকর বিজয়ের

পরই অবশেষে তারা দম ফেলার একটু ফুরসত পায়। শান্ত পরিবেশ, খাবারদাবার আর আশপাশের দ্বীপগুলো থেকে আসা ললনারা তাদেরকে পরিশ্রমের কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

ক্রুসেডারদের অ্যাকর বিজয়, তাদের বিশাল সেনাবাহিনী ও ক্ষমতা, ইউরোপ থেকে আসা সাহায্য, এশিয়ার ল্যাটিন রাষ্ট্র, অন্যান্য সহযোগী শক্তি সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিলো ক্রুসেডাররা যা হারিয়েছে, সবই তারা পুনরুদ্ধার করে ছাড়বে। কিন্তু ওই একটি শহর জয় করা ছাড়া তারা আর কোনো সাফল্যই পায়নি। কিছু ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সালাহউদ্দীনের সেনাবাহিনী চরম প্রতিরোধ বজায় রাখে।

যেসব কারণে ক্রুসেডারদের অগ্রগতি থমকে দাঁড়িয়েছিলো, তার একটি হলো সিসিলিতে ইংরেজ ও ফ্রেঞ্চদের মধ্যকার মতবিরোধ। এর চেয়েও কঠিন সমস্যা ছিলো জেরুজালেমের ফেরারি রাজা এবং টায়ারের শাসক মারকুইস কনরাড মন্টের মধ্যকার বিরোধ। ইংলিশ রাজার সমর্থন ছিলো জেরুজালেমের রাজার দিকে। অপরদিকে ফ্রেঞ্চ রাজা সমর্থন করেছিলেন টায়ারের শাসককে, যিনি জেরুসালেমের রাজা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। অ্যাকর বিজয়ের পর পুরনো মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, জেরুজালেমের রাজা আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকবেন, তারপর কনরাড মন্টে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। এরপর ফ্রেঞ্চ রাজা হঠাৎই ফ্রান্সে ফিরে যান এবং ইংরেজ রাজা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাঁর বর্বরতা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি সালাহউদ্দীনের দখলকৃত রাজ্যগুলো পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। উভয় পক্ষের মাঝে মুহুর্মুহু সংঘর্ষ হয়। এর মাঝে সবচেয়ে স্মরণীয় হলো আরসুফের যুদ্ধ, যেখানে ক্রুসেডাররা মুসলিমদেরকে পরাজিত করে। একে তারা হাত্তিনের প্রতিশোধ বলে মানে।

যুদ্ধের সমাপ্তি

দুই দলের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকে। ক্রুসেডাররা কয়েকবার জেরুজালেমের কাছাকাছি চলে আসে। একবার জেরুজালেমের দুই লীগ দূরত্বে পৌঁছে যায় তারা। কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রের আশংকায় ইংরেজ রাজা জেরুজালেম অবরোধ করার সাহস পাননি। আর এই যুদ্ধে যারা জেরুজালেমের প্রতিরক্ষায় আছে, তারা আগেরবারের লোকদের চেয়ে আলাদা। দুই পক্ষের যুদ্ধের ফলাফল একরকম অমীমাংসিত হয়ে যায়। ক্রুসেডাররাও জেরুজালেম বা অন্য কোনো শহর দখল করতে পারেনি, সালাহউদ্দীনও ক্রুসেডারদেরকে বিতাড়িত করে উপকূল থেকে সমুদ্রে ঠেলে দিতে পারেননি। উভয় পক্ষই সন্ধি করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু সন্ধির শর্ত নিয়ে মতবিরোধ লেগে যায়। অবশেষে ৫৮৮ হিজরি তথা ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে শা'বান মাসে রামাল্লায় সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো হলো:

* ক্রুসেডাররা উপকূলেই টায়ার থেকে হাইফা পর্যন্ত অবস্থান করবে।
* খ্রিষ্টানরা কর পরিশোধ ছাড়াই জেরুজালেম ভ্রমণ করতে পারবে।
* চুক্তির মেয়াদ হবে তিন বছর আট মাস।

উপকূলীয় যে এলাকায় ফ্র্যাংকরা অবস্থান করছিলো, তাকে পূর্ববর্তী জেরুসালেম রাজ্যের বর্ধিত অংশ বলে বিবেচনা করা হতো। নব্য জেরুজালেম রাজ্যের রাজধানী হয় অ্যাকর। চুক্তি সই করে তৃতীয় ক্রুসেডের সবচেয়ে বিখ্যাত চরিত্র রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্ট দেশে ফিরে যান।

এভাবে অসংখ্য প্রাণহানি, শহর ধ্বংস, জার্মান সাম্রাজ্যের ভরাডুবি, এবং

ইংলিশ ও ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্যের অসংখ্য সৈন্য হারানোর মাধ্যমে পাঁচ বছর পর তৃতীয় ক্রুসেডের অবসান ঘটে। ফ্র্যাংকরা অ্যাকর দখল করা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি। প্রাপ্তি ও হারানোর বিবেচনায় এ যুদ্ধে পরাজিত হয় ইউরোপীয় পক্ষ। পক্ষান্তরে সালাহউদ্দীনের আগমনের আগে যে মুসলিমদের হাতে কিছুই ছিলো না, হাত্তিনের যুদ্ধ ও রামাল্লা চুক্তির মাধ্যমে তাদের অধীনে এখন টায়ার ও অ্যাকরের মধ্যকার সরু উপকূলবর্তী এলাকা ছাড়া পুরো ফিলিস্তিন চলে আসে।

এভাবেই সালাহউদ্দীন হয়ে থাকেন ইতিহাসের স্মরণীয়তম চরিত্রগুলোর একটি। তিনি রাজাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করান, ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেন, জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন, ইসলামের গৌরব ফিরিয়ে আনেন, আর এমন এক রাজ্য গড়ে তোলেন যার পরিধি ছিলো উত্তর ইরাক (কুর্দিস্তান), লেভান্তের অধিকাংশ, শাম, মিশর, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, এবং বারকাহ। আর এ সবই ঘটে মাত্র অল্প কিছু সময়ের ব্যবধানে।

অধ্যায় আট

সালাহউদ্দীনের জীবনাবসান

১.

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, সালাহউদ্দীন স্বেচ্ছায় সন্ধিচুক্তি করেননি। কিন্তু সৈনিকদের অবাধ্যতা ও বিরক্তির কারণে তিনি তা করতে বাধ্য হন। আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিনকে পাক-পবিত্র করার জন্য তিনি জিহাদ চালিয়ে যেতে খুবই উদগ্রীব ছিলেন। তাঁর আশংকা হচ্ছিলো যে ক্রুসেডাররা তাদের শাসনাধীন শহরগুলোতে সবরকমের অনাচার-অনর্থ চালিয়ে যাবে। তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে দখল করে বসবে, এমন আশংকাও অমূলক ছিলো না।

আল-কাযী ইবনু শাদ্দাদ তাঁর *আন-নাওয়াদির আস-সুলতানিয়া* কিতাবে লেখেন:

> "আল্লাহর কসম! তিনি সমঝোতা চাননি। সমঝোতা সংক্রান্ত এক কথোপকথনে তিনি বলেন, 'আমি তাদের সাথে সমঝোতা করতে চাই না। কারণ, এমনটা করলে তারা হয়তো আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের সাথে লড়াই করে শহরগুলো পুনর্দখল করতে চাইবে। তাদের প্রত্যেকে একটা করে শহর শাসন না করা পর্যন্ত থামবে না।"

যা-ই হোক, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটানো এই যুদ্ধের পর উভয় পক্ষই রামাল্লা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজি হয়। উভয় পক্ষের জন্যই যুদ্ধটি ছিলো হতাশাজনক। সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও গঠনমূলক কাজের জন্য উভয় দলই চাইছিলো পরিস্থিতি শান্ত হোক। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুসলিম-খ্রিষ্টান উভয় পক্ষই যে কী পরিমাণ খুশি হয়, তার বর্ণনা দিয়ে আস-সুলুক কিতাবে আল-মাকরিযি বলেন, "চুক্তির দিনটি ছিলো স্মরণীয় একটি দিন। দীর্ঘ যুদ্ধের পর উভয় পক্ষেই স্বস্তির সুবাতাস বইতে থাকে।"

সালাহউদ্দীন ঘোষণা করেন, "চুক্তির কার্যকারিতা শুরু হয়ে গেছে। অতএব, তাদের মধ্য থেকে কেউ আমাদের শহরগুলোতে ঢুকতে চাইলে ঢুকুক। আমাদের কেউ ওদের শহরগুলোতে ঢুকতে চাইলে তাতেও আপত্তি নেই।" শান্তিচুক্তির

পর ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। মুসলিমরা ব্যবসায়িক কাজে ইয়াফফা যাতায়াত করতে থাকে। ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে আর জনগণ শান্তি-নিরাপত্তা উপভোগ করতে থাকে।

শুধু তা-ই না। খ্রিষ্টানদের অবাধ যাতায়াতের জন্য সুলতান সালাহউদ্দীন জেরুজালেমের দরজা খুলে দেন। বিপুল সংখ্যক খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীর খবর পেয়ে রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্ট শংকিত হয়ে যান যে, সালাহউদ্দীন বিরক্ত হতে পারেন। তাই তিনি সুলতানকে অনুরোধ করেন যেন লোকসংখ্যা কমিয়ে আনা হয় এবং রিচার্ডের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোনো খ্রিষ্টানকে জেরুজালেমে যেতে না দেওয়া হয়। কিন্তু সালাহউদ্দীন তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "এই তীর্থযাত্রীরা দূর-দূরান্ত থেকে এই পবিত্র ভূমিতে আসছে। আমার কোনো অধিকার নেই তাদেরকে বাধা দেওয়ার।" তিনি খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ করেন, তাদেরকে খাবার প্রদান করেন এবং তাদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন।

পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত রাজাদেরকে সালাহউদ্দীন সহনশীলতা, ক্ষমা, সুন্দর আচরণ ও নৈতিকতার মহান শিক্ষা দিয়ে গেলেন। রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্ট দেশে ফেরার আগেই এসবকিছু ঘটে। সালাহউদ্দীনকে আল্লাহ রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

২.

রামল্লা চুক্তির পর সালাহউদ্দীন জেরুসালেমের অবস্থা পরিদর্শন, ব্যবস্থাপনা, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল স্থাপন ও প্রশাসন তদারক করতে যান। তিনি হাজ্জে যেতে চান, কিন্তু ক্রুসেডারদের কাছ থেকে ক্ষতির আশংকায় রাজকুমাররা তা না করার পরামর্শ দেন। তিনি পরামর্শ মেনে নেন। তারপর উপকূলে গিয়ে ক্রুসেডারদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত দূর্গগুলোর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজে মন দেন। ২৬শে শাওয়াল তিনি জেরুজালেম থেকে নাবলুস, বিসান, টাইবেরিয়াস, বৈরুত হয়ে দামেস্কে যান। জনগণ দোকান-পাট বন্ধ করে তাঁকে বরণ করে নিতে এগিয়ে আসে। এমনটাই হওয়ার কথা। কারণ আল্লাহর ইচ্ছায় তিনিই তাদের দেশে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দমন করে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন।

দামেস্কে এসে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজ তদারক, দানের উপযুক্তদের মাঝে অর্থ

বিতরণ, সৈনিকদের ছুটিছাটা, জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ইত্যাদি কাজে মন দেন। দামেস্ক ছিলো শান্তিময় এক জায়গা। সেখানে তিনি ভাই আল-'আদিল এবং সন্তানদের সাথে শিকারে বের হন। দীর্ঘ দিবস রজনীর পরিশ্রমের পর অবশেষে তিনি একটু শান্তির সুবাতাস খুঁজে পান। আল-কাযী ইবনু শাদ্দাদ বলেন যে, দামেস্কের প্রশান্তি পেয়ে তিনি মিশরে আর ফিরে না যাওয়ার ইচ্ছা করেন। তিনি ইবনু শাদ্দাদকে দামেস্কে ডাকিয়ে আনেন। ইবনু শাদ্দাদ বলেন, "আমি তাঁর কক্ষে যাওয়ার পর তিনি আমাকে স্বাগত জানান, জড়িয়ে ধরেন এবং কান্না করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।"

৫৮৯ হিজরির ১৪ই সফর পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। তারপর হাজ্জফেরত জনগণকে অভ্যর্থনা জানাতে বের হন। হাজ্জীদের দেখে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং তাদের মধ্যকার একজন হওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। কিন্তু এই মহান নিয়ামত তাঁর তাকদিরে ছিলো না।

৩.

হাজ্জীদের সাথে মোলাকাত করে ফিরে এসেই তিনি পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। দিন দিন তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। চিকিৎসকরা শেষমেশ সব আশা ছেড়ে দেন। তাঁর রোগের কথা যখন ঘোষণা করা হয়, জনগণ ভীত ও দুঃখিত হয়ে পড়ে। অনেকে দামস্কের দূর্গের কাছে জড়ো হয়ে তাঁর খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করে, কেউবা আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকে। আল-কাযী ইবনু শাদ্দাদ এবং আল-কাযী আল-ফাদল ছাড়া আর কেউই তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি পাননি। সুলতানের অসুস্থতার পুরো সময়টা এই দুজন তাঁর সঙ্গ দেন।

ষষ্ঠ দিন। আল-কাযী ইবনু শাদ্দাদ তখন সুলতানের সাথে। ভৃত্যরা সুলতানের ঔষধ খাওয়ার পর পান করার জন্য ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসে। কিন্তু সুলতানের কাছে সে পানি খুব গরম মনে হলো। অন্য পানি আনা হলে তিনি বেশি ঠাণ্ডা বলে অভিযোগ করেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ মহান! কারো সামর্থ্য নেই পানি পরিবর্তন করার।" তিনি আসলে রাগান্বিত হয়ে এ কথা বলেননি। ইবনু শাদ্দাদ আরো বলেন, "আল-কাযী আল-ফাদল আর আমি বাইরে গিয়ে কাঁদতে

লাগলাম।" আল-কাদি আল-ফাদল বলেন, "তাঁর মতো উত্তম চরিত্রের অধিকারী কাউকে আর কখনো দেখতে পাবো না। আল্লাহর কসম! এমনটা যদি অন্য কোনো রাজার সাথে ঘটতো, তিনি চাকরকে পেয়ালা দিয়ে আঘাত করে বসতেন।"

ইবনু শাদ্দাদ বলেন:

> "দশম দিনে তাঁকে দুইবার ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়। তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে অল্প একটু পানি পান করেন। মানুষ সেদিন খুবই খুশি ছিলো। যখন বলা হলো তাঁর পা ঘামছে (জ্বর ছাড়ার লক্ষণ), তখন আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম। যখন জানানো হলো তাঁর সারা শরীর ঘামছে, তখনও আমরা খুশি হলাম। এগারো তম দিনে অর্থাৎ, ২৬শে সফর বলা হলো যে তাঁর শরীর এত ঘেমেছে যে বিছানা, মাদুর ও মেঝে ভিজে গেছে। ডাক্তাররা তাঁর জন্য কিছুই করতে পারলেন না।"

সালাহউদ্দীনের বড় ছেলে আল-মালিক আল-আফদাল নূরুদ্দীন 'আলী নিশ্চিত করলেন যে, সুস্থতার আর কোনো আশা নেই আর তাঁর পিতা এখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর। তিনি জনগণকে শপথ করালেন যে, তাঁর পিতা জীবিত থাকা পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন। তাঁর মৃত্যুর পর তা নূরুদ্দীনের হাতে আসবে। আন-নাওয়াদির আস-সুলতানিয়্যা কিতাবে ইবনু শাদ্দাদ শপথটির কথাগুলো উল্লেখ করেন:

> "এখন আমার নিয়্যাত ইখলাসপূর্ণ। আমি সুলতানের জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি অনুগত থাকবো। আমি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা করবো এবং তজ্জন্য আমার সম্পদ ও সময় ব্যয় করবো। আমার তলোয়ার ও সৈনিকেরা তাঁর আজ্ঞাধীন। তারপর তাঁর ছেলে আল-আফদাল নূরুদ্দীন 'আলী হবেন তাঁর উত্তরাধিকারী। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর আনুগত্য করবো, রাষ্ট্রকে নিজের জান-মাল ও তলোয়ার দিয়ে রক্ষা করবো এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবো। আমার ভেতর-বাহির একই (অর্থাৎ, মুখে যা বলছি অন্তরেও তা আছে)। আল্লাহই সর্বোত্তম সাক্ষী।"

৪.

২৭শে সফর বুধবার অসুস্থতার বারোতম দিনে সালাহউদ্দীনের স্বাস্থ্যের অবস্থা

আরো খারাপ হয় এবং তিনি একরকম কোমায় চলে যান। একজন কারীকে কুর'আন তিলাওয়াত করার জন্য আনা হয়। তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছান, সালাহউদ্দীনের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে:

"তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাঁর উপরই আমার ভরসা।"

২৭শে সফর, ৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দ, ফজর সালাতের পর তাঁর রূহ মহান রব্বের নিকট ফিরে যায়।

৫.

সালাহউদ্দীনের মৃত্যু ছিলো মুসলিমদের জন্য বিরাট এক ধাক্কা। ইবনু শাদ্দাদ ছিলেন এর চাক্ষুস সাক্ষী। তিনি সেসময়ে মুসলিমদের মনোবেদনার বর্ণনা দিয়ে বলেন:

> "এ ছিলো এক শোকের দিন। খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ জনের মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে উম্মাহ এমন শোকে আর কোনোদিন মূহ্যমান হয়ে পড়েনি। সেই দূর্গ, সেই জাতি ও এই পৃথিবী জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। আল্লাহর কসম! আমি কিছু মানুষকে তাঁর জন্য নিজের জীবন কুরবানি করে দেওয়ার কথা বলতে শুনেছি। এমন গুরুতর কথা আমি কখনো কাউকে বলতে শুনিনি। এমন কুরবানি যদি জায়েয হতো, তাহলে মনে হয় তা কবুল হয়ে তাঁর জীবনই বেঁচে যেতো। তাঁর ছেলেরা রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে কাঁদতে থাকে। মানুষ এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। যুহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত এই ছিলো পরিস্থিতি। 'আসর সালাতের আগে তাঁকে দাফন করা হয়। রাহিমাহুল্লাহ! তাঁর ছেলে আল-মালিক আয-যাফির শোকার্ত জনতাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।"

৬.

আল-কাযী আল-ফাদলের আনা একটি কাফনে মোড়া অবস্থায় 'আসরের আগে সালাহউদ্দীনকে তাঁর কবরের আবাসস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর কফিন

দেখামাত্র সবাই একসাথে এমনভাবে কান্না জুড়ে দেয় যে, মনে হতে থাকে একজন মানুষই এভাবে কাঁদছে। দামেস্কের দূর্গের প্রাঙ্গনে তাঁকে দাফন করা হয়। তিন বছর পর আল-উমাওয়াই মাসজিদের কাছেই এক নেককার লোকের কাছ থেকে একটি ঘর ক্রয় করেন আল-মালিক আল-ফাদল। তারপর তিনি একে সমাধির মতো বানান। 'আশুরা'র দিনে (১০ই মুহাররম) বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তিনি সালাহউদ্দীনের দেহাবশেষ সেখানে স্থানান্তর করেন এবং আল-উমাওয়াই মাসজিদের কাছে তিন দিন শোক পালন করেন।

সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর দিন মুসলিমরা এমন এক ঐতিহাসিক চরিত্রকে হারায়, যিনি মানুষের হৃদয়ে সম্মানের জায়গা করে নিয়েছিলেন। মায়েদের জন্য কতই না কঠিন এমন আরেকটি সন্তানের জন্ম দেওয়া, যার মাঝে একসাথে এত গুণাবলির সম্মেলন ঘটেছে: মহান, কুরবানিওয়ালা, সৎ এবং বীর যোদ্ধা। আল্লাহ তাঁকে আখিরাতে সম্মানিত করুন, তাঁর কবরকে আলোকিত করুন এবং জান্নাতে তাঁকে উঁচু মাকাম দান করুন।

৭.

মৃত্যুকালে সালাহউদ্দীন (রাহমাতুল্লাহ 'আলাইহি) এর বয়স ছিলো সাতান্ন বছর। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ সাতচল্লিশ দিরহাম ও এক দিনার। এছাড়া কোনো জমি, বাগান, খামার বা সম্পত্তি তিনি রেখে যাননি।

৮.

তাঁর মৃত্যুর পর অসংখ্য কবি তাঁকে নিয়ে কাব্যরচনা করে। তারা তাঁর মহান গুণাবলি বর্ণনা করে, যেমন জনগণের প্রতি তার ভালোবাসা। মুসলিমদের পবিত্র ভূমিসমূহের প্রতিরক্ষা ও হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করার প্রতীক হিসেবে তাঁকে তুলে ধরা হয়। এসব কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো 'ইমাদ আল-আসবাহানির লেখা একটি কবিতা:

রাজ্যগুলোকে শাসন করতো বিভেদ। সব ভালাই দূর হয়ে মন্দেরা জেঁকে বসেছিলো।

কোথায় সেই লোক যাকে আমরা অনুসরণ করতাম আর যার

আনুগত্য আল্লাহরই প্রতি ছিলো?

কোথায় আন-নাসির আল-মালিক যার নিয়্যাত ছিলো খালিস
আর কাজ ফী সাবীলিল্লাহ?

কোথায় সে নেতা যার শাসন ছিলো বহুলাকাঙ্ক্ষিত, যার কর্তৃত্বে
মন্দেরা ভীত, হে আল্লাহ?

কোথায় তিনি যিনি যুগের চাহিদা বুঝতেন, সম্মানিতদের
করতেন সম্মান?

কোথায় তিনি যার অসম সাহসিকতায় ক্রুসেডাররা সব হয়ে গেছে
অপমান?

জিহাদের রাহে শত দুখ ভোগী দুনিয়ারে দূরে ঠেলে দিলেন যিনি

জেনে নিয়ো আমরা তো সব মরেই আছি, শুধু বেঁচে আছেন
তিনি।

ইসলামের তরে সদা তৎপর জান্নাতে পেতে স্থান

এমনই এক রাজা তিনি যিনি দ্বীনের তরে কুরবান।

ইয়াতীম এবং বিধবাদের প্রতি তিনি ছিলেন সদা দানশীল-
দয়াময়,

সীমান্তগুলো আজ অনিরাপদ কারণ কারো জিহাদ তাঁর জিহাদের
মতো নয়।

হায় ইসলামের জন্য! প্রতিটি মুমিনের মন ভরে গেছে ভয়ে,

ঘণ্টার মতো করে তাঁর আমলের বছরগুলো গেছে বয়ে।

রহমত দিয়ে ভরে দিও তাঁকে, ইয়া রাহমানুর রাহীম!

প্রশংসা তোমারই, হে রব্বুল 'আরশীল 'আযীম!

অধ্যায় নয়

ক্রুসেডারদের উপর বিজয়ের কারণ

আগেই বলা হয়েছে হাত্তিনের যুদ্ধ ছিলো চূড়ান্ত ফয়সালাকারী এক বিজয়। এর ফলাফল ছিলো জেরুজালেমের উপর ক্রুসেডের শতবর্ষব্যাপী দখলদারিত্ব ও যুলুমের অবসান শেষে স্বাধীনতা অর্জন। তাদের পরাজয় ও হাজার হাজার নিহত-আহত-বন্দী সৈনিকের কথা ইতিহাসে লেখা আছে।

মুসলিমদের এই বিজয়ের পেছনে বেশ কিছু কারণ সক্রিয় রয়েছে। যেসব বীজ বপন করার ফলে সাফল্যের চারা গজিয়ে তা মহীরুহে পরিণত হয়, তার কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখতে হবে যে সামরিক ও রাজনৈতিক কলাকৌশল দিয়ে এ বিজয় অর্জিত হয়নি। এই জয়ের কারণ হলো বদর, উহুদ, ফাতহ মক্কা সহ যাবতীয় যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসৃত পদ্ধতির অনুসরণ। এ জয়ের কারণ হলো কাদিসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) অনুসৃত পদ্ধতির অনুসরণ। এভাবেই এসেছে সালাহউদ্দীনের বিজয়। সাহাবীদের ঈমানি জযবা নিয়ে নববী তরিকা অনুসরণ করেছেন বলেই সালাহউদ্দীনকে আল্লাহ অনুগ্রহ করে বিজয় দান করেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

> "আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত। (এরা হলো তারা,) যাদেরকে আমি জমিনে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে। সকল কাজের শেষ পরিণাম আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।"[৩৩]

যেকোনো স্থানে, যেকোনো সময়ে মুসলিম উম্মাহ এই আয়াতের শর্তগুলো পূরণ করলে আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দিয়ে সম্মানিত করবেন। আল্লাহ আরো বলেন:

> "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে, আল্লাহ

[৩৩] সূরাহ আল-হাজ্জ ২২:৪০-৪১

উম্মাহর মায়েদের প্রতি

তারা যেন অন্তত আর একজন সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর জন্ম দিতে পারে।

মু'মিনদেরকে দৃঢ়পদ রেখো।" অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে ভিতি সঞ্চার করবো। কাজেই তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো। আঘাত হানো প্রতিটি আঙ্গুলের গিঁটে গিঁটে। এর কারণ হলো তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, (তাদের জেনে রাখা দরকার যে,) আল্লাহ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর।"[৩৫]

তিনি আরো ঘোষণা করেন:

"আর আল্লাহ যে এটা করেছিলেন, এর উদ্দেশ্য তোমাদেরকে সুসংবাদ দান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যাতে এর মাধ্যমে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। কারণ সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। আল্লাহ তো মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"[৩৬]

সালাহউদ্দীন হারাম কর্মকাণ্ড ও অনৈতিকতা প্রতিরোধে খুবই তৎপর ছিলেন। তিনি মিশরের শাসনভার পাওয়ার পর সবরকম প্রকাশ্য পাপাচার ও অশ্লীলতা বন্ধের ব্যবস্থা নেন। এ ধরনের পাপাচার মিশরে খুবই প্রসার লাভ করেছিলো। বিশেষ করে ফাতিমি যুগে নওরোজ (নববর্ষ) জাতীয় উৎসবগুলো অশ্লীলতায় সয়লাব হয়ে যেতো। আল-মাকরিযি তাঁর বই খুতুত-এ বলেন যে, এসব পালা-পার্বণে প্রকাশ্য অশ্লীলতা-অনৈতিকতা ছিলো খুবই স্বাভাবিক। এই দিনে বহু লোকবেষ্টিত হয়ে "নওরোজ রাজ" বাহনে চড়তেন। সম্ভ্রান্তদের উপর আরোপিত এক ধরনের ট্যাক্স এই দিনে সংগ্রহ করা হতো[৩৭]। চরিত্রহীন লোকেরা এসে রাজপ্রাসাদের নিচে জড়ো হয়ে ফাতিমি খলিফার মনোরঞ্জন করতো। উচ্চস্বরে হট্টগোল করা হতো, মদপান করা হতো আর মানুষের গায়ে মদ ও পানি ছিটানো হতো। সম্মানিত কোনো লোক এই দিনে ঘরের বাইরে বের হলে পরিষ্কার জামাকাপড় নিয়ে ফিরতে পারতো না।

সালাহউদ্দীনের জীবনের আধ্যাত্মিক অংশের ব্যাপারে আল-কাযী বাহাউদ্দীন লিখেন:

---

[৩৫] সূরাহ আল-আনফাল ৮:১২-১৩
[৩৬] সূরাহ আল-আনফাল ৮:১০
[৩৭] পহেলা বৈশাখে উৎসবমুখর পরিবেশে খাজনা আদায়ের মুঘল সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্য লক্ষণীয়- বাংলা অনুবাদক

> “তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন বিনয়ী এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা এক মুখলিস বান্দা। কুর’আন তিলাওয়াত করা হলে তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও কান্না করতেন। তিনি ইসলামী উপলক্ষগুলোকে ভালোবাসতেন। দার্শনিক ও বিদ’আতি গোষ্ঠীগুলোকে ঘৃণা করতেন। রাজ্যে কোনো মুলহিদ-যিন্দিকের খবর পেলে তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দিতেন। তিনি ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে সবসময় কঠোর ছিলেন। তিনি যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। তাঁর একজন ব্যক্তিগত ইমাম ছিলেন, যিনি তাঁকে সালাতে ইমামতি করতেন। সেই ইমাম অনুপস্থিত থাকলে অন্য কোনো নেককার লোকের ইমামতিতে সালাত পড়তেন। তিনি সুন্নাত সালাতগুলোও যথাযথভাবে আদায় করতেন। তিনি রাতের শেষাংশে কিছু রাক’আত নফল সালাত পড়তেন। আর রাতে উঠতে না পারলে ফজরের আগে পড়ে নিতেন।”

আর-রাওদাতাইন ফি আখবারুদ দাওলাতাইন কিতাবে আশ-শামাহ বলেন যে, তিনি সালাহউদ্দীনকে মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতাকালেও সালাত পড়তে দেখেছেন। শেষ তিনদিনে যখন অবচেতন ছিলেন, তখনই কেবল তাঁর সালাত ছুটে যায়। সফররত অবস্থায় সালাতের সময় আসলে তিনি বাহন থামিয়ে সালাত পড়ে নিতেন।

তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ও তাঁর নিয়োগ করা গভর্নরদেরকে সৎ, ধার্মিক ও আল্লাহর হুকুম-আহকামের প্রতি অনুগত, জনগণের অধিকার সংরক্ষণকারী, ও ন্যায়পরায়ণ থাকার তালিম দিতেন। মুসলিম ইতিহাসবিদদের থেকে পুল বর্ণনা করেন যে, সালাহউদ্দীন একবার তাঁর সন্তান আয-যাহিরকে বলেছিলেন:

> “আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার এবং তাঁর বিধি-বিধানগুলো প্রতিষ্ঠিত করার। কারণ এটিই নাজাতের পথ। রক্ত ঝরানোর ক্ষেত্রে সতর্ক হও, কারণ রক্ত কখনো (প্রতিশোধ না নিয়ে) থেমে থাকে না। আমি আদেশ দিচ্ছি আমার প্রতিনিধি এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে তুমি জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করবে ও তাদের প্রতি যত্নশীল হবে।”

এই ছিলেন সালাহউদ্দীন! এমন বান্দাকে কি আল্লাহ বিপদের মুখে একলা ছেড়ে দিতে পারেন?

আল-কাযী ইবনু শাদ্দাদ বলেন:

> "তাঁকে যখন বলা হলো যে, মুসলিম সেনাবাহিনীকে শত্রুরা হারিয়ে দিয়েছে, তখন তিনি সেজদায় পড়ে বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! আমার দুনিয়াবি আসবাব শেষ হয়ে গেছে। তাই আমি আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করতে ব্যর্থ হয়েছি। আপনার সাহায্য, আপনার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, আর আপনার রহমতের উপর ভরসা করা ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট, আর আপনি হলেন শ্রেষ্ঠ কর্মবিধায়ক।"

তাঁকে সালাতে এত কাঁদতে দেখেছি যে, অশ্রু গড়িয়ে তাঁর দাড়ি ও মাদুর ভিজে গিয়েছিলো। তিনি কী পড়তেন তা-ই শোনা যাচ্ছিলো না। তারপর একদিন তাঁকে খবর দেওয়া হলো যে মুসলিম সেনাবাহিনী জয়লাভ করেছে। তিনি জুমু'আর দিনে যুদ্ধ করতেন যাতে হাদীসে বর্ণিত দু'আ কবুলের সেই বিশেষ মুহূর্তে করা দু'আর সুযোগ নিয়ে তিনি জয়লাভ করতে পারেন।"[৩৮]

খুলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের সৈনিকদের আল্লাহকে ভয় করা ও হারাম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন, সমগ্র উম্মাহকে ইসলামী নিয়ম-কানুন মেনে চলার হুকুম দিতেন। সালাহউদ্দীনও তাঁদের পথ অনুসরণ করেন। পারস্য জয় করতে যাওয়ার সময় সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে লেখা এক চিঠিতে 'উমার বিন খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন:

> "পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার। কারণ তাকওয়াই হলো শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বোত্তম প্রস্তুতি ও সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্র। আপনি এবং আপনার সাথে যারা আছে, সবাই যেন হারাম কাজ ত্যাগ করে। কারণ হারামে লিপ্ত হওয়াই আমাদের উপর শত্রুদের প্রাধান্য বিস্তারের কারণ। মুসলিমরা জয়লাভ করে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য এবং আল্লাহর প্রতি শত্রুদের অবাধ্যতার কারণে। শত্রুদের পার্থিব শক্তি-সরঞ্জাম আমাদের চেয়ে

[৩৮] সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে জুমু'আর দিনে একটি সময় আছে যখন বান্দা আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলে তা কবুল করা হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হাদিসটি বর্ণনা করার সময় বলেন, সময়টি খুব অল্প। আর আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণিত হাদিসে আছে সময়টি হলো, ইমামের বসা থেকে নামায শেষ করার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে। - সম্পাদক

বেশি। আল্লাহর আনুগত্যই আমাদের শক্তি। আমাদের উভয় পক্ষের গুনাহ যদি সমান হয়ে যায়, তাহলে তারা পার্থিব শক্তিবলে আমাদেরকে হারিয়ে দেবে। মনে রাখবেন, ফেরেশতাদ্বয় আপনার আমলনামা লিখছে এবং তাঁদের প্রতি লজ্জিত থাকা উচিত। এমনটা বলবেন না যে, 'আমাদের শত্রুরা আমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহর অবাধ্য। তাই আমরা ভুল করলেও আল্লাহর গযব আমাদের উপর আসবে না।' আল্লাহ যেভাবে বনী ইসরাঈলের উপর অন্যদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন, সেভাবে আপনার উপরও অন্যদেরকে কর্তৃত্ব দিয়ে দিতে পারেন। তিনি মাজুসিদেরকে (অগ্নিপূজারী) তাদের উপর ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আপনাদের সাহায্য করেন এবং শত্রুদের উপর আপনাদেরকে বিজয় দান করেন। আপনার ও আমার জন্য আল্লাহর কাছে এই দু'আই করি।"

মোটকথা, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করা ছাড়া মুসলিম উম্মাহ কখনোই শত্রুদের উপর জয়লাভ করতে পারবে না। বিজয় ও চিরস্থায়ী জিন্দেগির রাস্তা কেবল এটিই।

পূর্ণ প্রস্তুতি ও অটুট লক্ষ্য

ইতিহাসবিদরা একমত যে, সালাহউদ্দীন জেরুজালেম মুক্ত করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। দ্বীনি ও নৈতিক প্রস্তুতির মতোই তিনি জোরেশোরে সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করেন। যেমন, তিনি আলাদা একটি বিভাগ খোলেন যাদের কাজ ছিলো সৈন্যদের এক শিবির থেকে আরেক শিবিরে ঘুরে ঘুরে তাদের ঘোড়া, অস্ত্র, সামরিক পোশাকসহ সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। এছাড়া তিনি অস্ত্র ও জাহাজশিল্পকে উন্নত করা, বিস্ফোরক, মাইন, মিনজানিক ও অন্যান্য সামরিক হাতিয়ার তৈরির ক্ষেত্রেও খুব তৎপর ছিলেন।

তিনি নৌবাহিনীর ব্যাপারেও খুব সজাগ ছিলেন। এ সংক্রান্ত আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক অবস্থা তদারকির জন্যও তাঁর আলাদা বিভাগ ছিলো। এই নৌবহর বিভাগের প্রধানকে বলা হতো সাগরের আমির বা পানিপথের আমির।[৩৯]

এই সর্বব্যাপী প্রস্তুতি নিয়েই তিনি দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে শত্রুদের উপর আক্রমণ করেন এবং তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। আর এভাবেই সালাহউদ্দীনের হাতে শত্রুরা পরাজিত হয় এবং ইসলামের গৌরব পুনরুদ্ধার হয়।

মুসলিম ভূখন্ডগুলোর রাজনৈতিক ঐক্য

৫৬৭ হিজরিতে ফাতিমি খলিফার মৃত্যু হলে সালাহউদ্দীন মিশরের শাসক হন। তিনি দক্ষিণ মিশর (নুবিয়া), ইয়েমেন ও হিজায জয় করে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। লোহিত সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। এছাড়া নূরুদ্দীনের মৃত্যুর পর শামে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লে সালাহউদ্দীন দামেস্ক, হালাব ও অন্যান্য কিছু শহর নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এভাবে উত্তর ইরাক (কুর্দিস্তান), শাম, ইয়েমেন, মিশর, বারকাহ ও অন্যান্য আরো অনেক শহর মিলে বিশাল এক মুসলিম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

জেরুজালেম মুক্ত করার ক্ষেত্রে এই সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম ভূমিগুলো যখন একজন মুমিন নেতা, অভিজ্ঞ বীর, সাহসী ও অভিজ্ঞ শাসক ও ন্যায়পরায়ণ রাজার অধীনে দ্বীনি ও রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে অবস্থান করে, তখন শত্রুদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। দুষ্ট কাফিরদের হাত থেকে মুসলিমদের প্রথম কিবলা, তৃতীয় সবচেয়ে সম্মানিত মসজিদ, মি'রাজের স্থান ও 'ঈসার ('আলাইহিসসালাম) জন্মভূমিকে উদ্ধার করতে সালাহউদ্দীন এ সবকিছুই বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহর কালেমাকে উচ্চে তুলে ধরার লক্ষ্য

ইসলামী শরীয়তে জিহাদে যাওয়ার আগে সৈনিককে অবশ্যই নিয়্যাত ঠিক করতে হবে। তাকে যুদ্ধে যেতে হবে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। গানিমাত, খ্যাতি, অনৈসলামী চেতনা কিংবা নিফাকের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে গেলে হবে না। আল্লাহ্ বলেন:

> "ঈমানদাররা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায় আর কাফিররা যুদ্ধ করে তাগুতের রাস্তায়।"[৪০]

রাসূলুল্লাহকে ﷺ এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে বীরত্ব, জাতিয়তাবাদী চেতনা বা নিফাকের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে যায়। এমন ব্যক্তিদের মাঝে কে আল্লাহর রাস্তার যোদ্ধা তা জানতে চাওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চে তুলে ধরার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে।"[৪১]

এই ইসলামী নিয়্যাত নিয়েই সালাহউদ্দীন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। আল-কাদি বাহাউদ্দিন ইবনু শাদ্দাদের লেখা *আন-নাওয়াদির আস-সুলতানিয়্যা* কিতাবের একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেন:

> "আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি, তা বর্ণনা করছি। ৫৮৪ হিজরির যুলকা'দা মাসে মিশরীয় সৈন্যদেরকে ছুটি দেন। তাঁর ভাই আল-মালিক আল-'আদিলের নেতৃত্বে মিশরীয় সৈনিকেরা দেশে ফিরে যায়। জেরুসালেমে 'ঈদের সালাত শেষে তাদেরকে বিদায় জানাতে সালাহউদ্দীন তাদের সাথে এগোতে থাকেন। তিনি আস্কালন পর্যন্ত তাদের সাথে যান। ফিরে

[৪০] সূরাহ আন-নিসা ৪:৭৬
[৪১] আল-বুখারি ও মুসলিম

আসার সময় তিনি উপকূলীয় অঞ্চল হয়ে অ্যাকর দিয়ে ফেরত আসার কথা ভাবেন। তাহলে উপকূলীয় শহরগুলোর অবস্থাও তদারক করা যাবে। তাঁর সাথীরা এমনটা করতে নিষেধ করেন। কারণ মিশরীয় সেনাদের চলে যেতে দেখে টায়ারের ক্রুসেডাররা আক্রমণ করে বসতে পারে। তিনি এ কথায় কান দিলেন না। তাঁর ভাইকে বিদেয় দিয়ে আমরা তাঁর সাথে উপকূলীয় এলাকা হয়ে অ্যাকরের দিকে চললাম। তখন ছিলো শীতকাল আর উত্তাল সাগরে ছিলো পাহাড়সম ঢেউ। আমি দৃশ্য অবলোকনে বুঁদ হয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আমি আপনাকে কিছু কথা জানাতে চাই। আল্লাহ্ যদি আমাকে উপকূলের বাকি অংশগুলো জয় করার তাওফিক দেন, তাহলে আমি শহরগুলো (আমার ছেলেদের মাঝে) ভাগ-বাটোয়ারা করে দেবো। তারপর আমার উইল লিখে আপনার হাতে দিয়ে জাহাজে করে ক্রুসেডারদের দ্বীপগুলোতে চলে যাবো, যাতে কুফফারদের সব দলগুলোকে পরাস্ত করতে পারি অথবা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যেতে পারি।"

তাঁর কথা শুনে আমার খুবই খুশি লাগলো। আমি বললাম, 'আপনার নিজের ও সৈনিকদের জীবনের ব্যাপারে এমন ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। সৈনিকেরা ইসলামের প্রহরী।' তিনি বললেন, 'আমাকে একটি ফাতওয়া জানান। দুই মৃত্যুর মধ্যে কোনটি বেশি উত্তম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত।' তিনি বললেন, 'সেটাই আমি চাই।'

কতই না বিশুদ্ধ নিয়্যাত! কতই না সাহসী সে বীর! রাহিমাহুল্লাহ! হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি আপনার রহমত প্রত্যাশী ছিলেন। তাঁকে আপনি রহম করুন।

যুদ্ধাবস্থায় আল্লাহর কাছে তাঁর দু'আ করার কথা তো বলাই হলো। তিনি দু'আ করেছিলেন, "'হে আল্লাহ! আমার দুনিয়াবি আসবাব শেষ হয়ে গেছে। তাই আমি আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করতে ব্যর্থ হয়েছি। আপনার সাহায্য, আপনার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, আর আপনার রহমতের উপর ভরসা করা ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট, আর আপনি হলেন শ্রেষ্ঠ কর্মবিধায়ক।"

শত্রুদের প্রতি তাঁর মহান আচরণ দেখেও বোঝা যায় যে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করতেন, দুনিয়াবি ক্ষমতার লালসা বা রক্তপিপাসার কারণে নয়। কী পশ্চিমা, কী প্রাচ্যীয়, কী ওরিয়েন্টালিস্ট, কী মুসলিম – সকল ইতিহাসবিদই তাঁর এমন আচরণের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ক্রুসেডারদের মধ্যকার গরীব, বিকলাঙ্গ ও বয়স্কদেরকে টাকা ও সওয়ারির ব্যবস্থা করে দেওয়া, মুক্তিপণের বিনিময়ে সবাইকে ছেড়ে দিতে রাজি হওয়া এ সবই তাঁর মহানুভবতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এমন আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

এ প্রসঙ্গে হাত্তি বলেন, "আটাশি বছরের ব্যবধানে সাধারণ মুসলিমদের প্রতি ক্রুসেডারদের আচরণ আর সাধারণ ক্রুসেডারদের প্রতি মুসলিমদের আচরণের পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক।" ক্রুসেডারদের প্রতি সালাহউদ্দীনের আচরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে নারী, শিশু, বৃদ্ধদের প্রতি সালাহউদ্দীনের এমন অনেক আচরণের কথা বলা হয়েছে।

মুসলিম ভূখণ্ডের মুক্তি সমগ্র উম্মাহ'র দায়িত্ব

ইসলামী বিধান হলো, মুসলিমদের কোনো ভূখণ্ড শত্রু কাফিরদের দখলে চলে গেলে তা পুনরুদ্ধার করতে সমগ্র উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে তাদের সবাই যদি এ আসমানি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তাহলে সবাই গুনাহগার হবে।

আল্লাহ বলেন:

> "তোমরা যদি (যুদ্ধে) অগ্রসর না হও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন আর তোমাদেরকে অন্য জাতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে দেবেন। আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে

পারবে না। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর কর্তৃত্বশীল”।[৪২]

আল্লাহ্ আরো বলেন,

> “বেরিয়ে পড়ো, (স্বাস্থ্য, বয়স, সম্পদ বা অস্ত্রের দিক থেকে) অবস্থা ভারীই হোক আর হালকাই হোক। আর আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকো। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।”[৪৩]

এই মূলনীতির ভিত্তিতেই সালাহউদ্দীন বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের সেনাদেরকে এক ইসলামের পতাকার নিচে সমবেত করেন। তারা এক দেহের মতো হয়ে সম্মিলিতভাবে শত্রুদেরকে আক্রমণ করে। কেন হবে না? এক ইসলামের পতাকাতলে আসলে তারা একে অপরের প্রতি এমনই দয়ালু হয়ে ওঠে যেমনটা দেহের এক অঙ্গে ব্যথা হলে সকল অঙ্গই অস্থির হয়ে যায়।

বিভিন্ন জাতি-গোত্র-ভাষা-বর্ণের মানুষেরা এক পতাকাতলে এসে গেলে তাদের মাঝে তাকওয়া ছাড়া আর কোনো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি থাকে না। আরব-অনারব, সাদা-কালো দিয়ে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ হয় না। তারা সকলে যে এক ঈমান, এক দ্বীন, এক কুর'আন ও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী। যত বিঘত ভূমিতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, যত কেল্লায় ইসলামের পতাকা ওড়ে, সবই তো তাদের সমষ্টিগত মালিকানা।

এক কবি বলেন:

স্বদেশ আমার ইসলাম
নীলনদ কিংবা শাম,
আল্লাহর যিকর হলেই হলো
যা-ই হোক স্থানের নাম।

সালাহউদ্দীনের শত্রুরা জীবনকে ভালোবাসতো আর তাঁর সৈনিকেরা শাহাদাতকে ভালোবাসতো। শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শহীদের

---

[৪২] সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৩৯
[৪৩] সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৪১

কাছে মনে হয়:

মৃত্যু তো আসবেই থাকি আমি যেকোনো শহরে,
হোক না তাহলে সে মৃত্যু ইসলামেরই চাদরে।
বলবো আমি, "দৌড়ে এসেছি, হে আল্লাহ! তোমার পথ।
সফল হয়ে গিয়েছি আমি, কা'বার রবের শপথ!"

ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে যে কেউ আল্লাহকে রব্ব, ইসলামকে দ্বীন আর মুহাম্মাদকে ﷺ নবী ও রাসূল বলে মেনে নিয়েছে, সে-ই সালাহউদ্দীনের সেনা। কারণ তারা যে উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে যুদ্ধ করতো, তার শেষ প্রান্তে মৃত্যু নেই, আছে শাহাদাত।

অধ্যায় দশ

সেই ফিলিস্তিন, এই ফিলিস্তিন

সালাহউদ্দীনের বিজয়ের কারণ আলোচনা করতে গেলেই আজকের দিনে ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের পরাজয়ের কারণগুলো সামনে চলে আসে। বলা চলে বিংশ শতাব্দী থেকে মুসলিমরা শোচনীয়ভাবে মার খেয়ে চলেছে। তাও কাদের হাতে? ইতিহাসের সবচেয়ে লাঞ্ছিত জাতির হাতে। যাদেরকে আল্লাহ বানর ও শূকরে পরিণত করে দিয়েছিলেন, তাদের হাতে। যাদের উপর আল্লাহর গযব, তাদের হাতে। যারা ইতিহাসে সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক, ভীতু আর ধুরন্ধর জাতি হিসেবে পরিচিত, তাদের হাতে। আগের অধ্যায়ে আমরা মুসলিমদের জয়ের কারণ আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা করবো ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নিয়ে এই বইয়ের প্রকাশকাল[৪৪] পর্যন্ত মুসলিমদের পরাজয়ের কারণসমূহ। লেখকের মতে, প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন

হাত্তিনে মুসলিমদের বিজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো ইসলামী অনুশাসনের প্রতি মুসলিমদের দৃঢ় আনুগত্য। আর আজকে আমাদের পরাজয়ের কারণ হলো ঠিক এই ক্ষেত্রেই দুর্বলতা। এর ফলে জিহাদে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনও খবর এসেছে যে ময়দানের প্রথম সারির কিছু যোদ্ধা মদপান করে আর বেশ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর শত্রুরা দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এদের এই নৈতিক দুর্বলতা।

রেডিও স্টেশনগুলো থেকে আমরা ঘোষিত হতে শুনেছি, "শত্রুদেরকে তুমুল আঘাত কর! অমুক শিল্পী তোমাদের পক্ষে। অমুক নায়ক-নায়িকা তোমাদেরকে

সমর্থন জানিয়েছে।” কোথায় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে তা না, এইসব নিয়ে পড়ে আছে!

এমনও খবর পাওয়া গেছে যে আরব নেতাদের কেউ কেউ যোদ্ধাদের কাছে নায়িকা-গায়িকাদের উত্তেজক ছবি বিলি করে তাদের অধঃপতনকে তরান্বিত করেছে।

এমনও খবর এসেছে যে, ১৯৬৭-এর যুদ্ধের এক মাস আগে যোদ্ধাদের মাঝে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ ম্যাগাজিন বিতরণ করা হয়েছে। এসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ্যে শির্ক-কুফরের দিকে আহ্বান করতো। এক নাস্তিক সাংবাদিক সেখানে প্রবন্ধ ছেপেছে “কেমন হওয়া উচিত নয়া জমানার আরবদের?” শিরোনামে। সে লিখেছে: “আরব বিশ্ব মধ্যযুগে আল্লাহর সাহায্য চেয়েছে। ইসলামী ও খ্রিষ্টীয় জীবনাচারে আশ্রয় খুঁজেছে, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদীসহ অন্যান্য শক্তিগুলোর মদদ চেয়েছে। কিন্তু এ সবই ব্যর্থ হয়েছে। একটি সফল আরব সভ্যতা গড়ে তোলার একমাত্র উপায় হলো আরবদের মাঝে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার ঘটানো।”

এই সাংবাদিক এমন মানুষ চায় “যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ, ধর্মসমূহ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, উপনিবেশবাদসহ প্রাচীন সমাজের সব আদর্শ ইতিহাসের জাদুঘরের কিছু মমি মাত্র।”

আল-মু'আলিম আল-'আরাবি ম্যাগাজিনে এক নাস্তিক কবি তার দ্বীন-দুনিয়াকে শয়তানের কাছে বিক্রি করার ঘোষণা দিয়ে কবিতা পর্যন্ত লিখেছে।[৪৫] সে খোলাখুলি নাস্তিকতা, চরম অশ্লীলতা ও ভ্রান্ত মত-পথের দিকে আহ্বান করেছে। সে লিখেছে:

আমি ফিলিস্তিনের গান গাই,
যার পা নাই, পথ নাই।
তারা জানতে চায় কে কে নামাজ পড়েনি,
অথচ নামাজ তো তাদের কাজে আসেনি।
আল্লাহ তো কবেই মরে গেছে মূর্তিদের সাথে,

---

[৪৫] সালিহ 'আদিমাহ, “নাশিদ আল-আরুশাহ আদ-দা'আহ”, আল মু'আলিম আল-'আরাবি, ইশ্যু-৫, অক্টোবর ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৫৪

গায়েবের মদদ চায় তারা মোনাজাতের হাতে।
গায়েবি সাহায্য তারাই চায় যারা হীনবল
নির্ভয়ে লড়ে যারা, তারাই শুধু সবল।

সে আরো লিখেছে:

তারা অজুহাত খোঁজে, দোষ দিয়েছে ধৈর্যহীনতাকে,
তাই আমি অস্বীকার করলাম ফিলিস্তিনের আল্লাহকে।

অবাক করা ব্যাপার হলো, এই ম্যাগাজিনের সম্পাদক দাবি করেছে এটা নাকি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য নৈতিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এখানেই আবার মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস ও মুহাম্মাদের ﷺ আনীত বার্তার ব্যাপারে চরম বিদ্বেষপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়। এইসব পত্র-পত্রিকা পড়ে কি যোদ্ধারা কখনও মুসলিমদের শত্রুদের হারাতে পারবে? আল্লাহ কি তাদেরকে সাহায্য করবেন?

এদের অবস্থা কি আবু জাহলের (লা'নাতুল্লাহ 'আলাইহি) মতো নয়? আবু সুফিয়ান যখন খবর দিলেন যে তাঁদের কাফেলা এখন নিরাপদ, তখনও আবু জাহল গোঁয়ারের মতো বলে ওঠে, "আল্লাহর কসম! আমরা বদরে গিয়ে সেখানে তিনদিন অবস্থান করবো, উদরপূর্তি করবো, পশু জবাই দিবো, মদপান করবো, গান-বাজনা করবো, আরবদের প্রশংসা শুনবো, তারপর ফিরে আসবো।"

'উমার বিন খাত্তাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) সেই চিঠি থেকে তো স্পষ্টই হয়ে গেছে কোন পথে বিজয় আসে। তাঁর সেই চিঠি এ যুগেও একইরকম প্রাসঙ্গিক:

"পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার। কারণ তাকওয়াই হলো শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বোত্তম প্রস্তুতি ও সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্র। আপনি এবং আপনার সাথে যারা আছে, সবাই যেন হারাম কাজ ত্যাগ করে। কারণ আমাদের হারামে লিপ্ত হওয়াই আমাদের উপর শত্রুদের প্রাধান্য বিস্তারের কারণ। মুসলিমরা জয়লাভ করে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য এবং আল্লাহর প্রতি

শত্রুদের অবাধ্যতার কারণে। শত্রুদের পার্থিব শক্তি-সরঞ্জাম আমাদের চেয়ে বেশি। আল্লাহর আনুগত্যই আমাদের শক্তি। আমাদের উভয় পক্ষের গুনাহ যদি সমান হয়ে যায়, তাহলে তারা পার্থিব শক্তিবলে আমাদেরকে হারিয়ে দেবে।”

হারামে লিপ্ত হওয়া ও সাধারণ গুনাহর ব্যাপারেই যদি এমন কথা বলা হয়, তাহলে প্রকাশ্যে নাস্তিকতার দিকে আহ্বানকারীদের অবস্থা কেমন হবে? মুসলিম উম্মাহকে, বিশেষ করে আরব জাতিকে এই বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

“আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত।”[৪৬]

“যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় রাখবেন।”[৪৭]

মতানৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদ

হাত্তিনের বিজয়ের একটি কারণ ছিলো এক নেতৃত্বের অধীনে মুসলিমদের রাজনৈতিক ঐক্য। আর আজকের পরাজয়ের কারণ হলো মতানৈক্য ও ঝগড়াঝাটি। মুসলিম শাসকদের মাঝে প্রচুর দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, পাল্টাপাল্টি দোষারোপের ঘটনা ঘটেছে। জনসাধারণও এসব প্রত্যক্ষ করেছে। শাসকরা একে অপরের বিরুদ্ধে চর নিয়োগ করে, ষড়যন্ত্র করে। আর শত্রুরা নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করতে করতে এসব ঝগড়া-বিবাদ দেখে মুখ টিপে হাসে। তারা সারা বিশ্বের ইয়াহুদীদেরকে ইসরায়েলে গিয়ে জড়ো হতে বলে। নীল থেকে ফুরাত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা দিনরাত কাজ করে

[৪৬] সূরাহ আল-হাজ্জ ২২:৪০
[৪৭] সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:৭

চলে।

ইসলামকে ছেড়ে দেওয়ার কারণেই আরব শাসকদের মাঝে আজ এসকল মতানৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা পূর্ব-পশ্চিম সবখান থেকে এনে স্তূপ করা নীতি-নৈতিকতার এক অদ্ভুত সমষ্টির অনুসরণ করে। জনগণ তাই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কর্মপদ্ধতিগত ও আদর্শগত – উভয় রকমের মতভেদই বিদ্যমান। কেউ ওয়াশিংটনকে মানে, তো কেউ লন্ডনকে। কেউ মস্কোকে মানে, তো কেউ বেইজিংকে। একদলকে বলা হয় ডানপন্থী, আরেকদলকে বলা হয় বামপন্থী। কেউ প্রগতিশীল, তো কেউ রক্ষণশীল। আরবের মুসলিম উম্মাহ আজ কত নামে, কত রাষ্ট্রে, কত শহরে, কত দলে যে বিভক্ত! ইসলামকে যারা অনুসরণই করে না, তাদেরকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করা কীভাবে সম্ভব? আল্লাহ বলেন:

> "আর নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, অতএব এরই অনুসরণ কর। আর বিভিন্ন পথের অনুসরণ কোরো না, কারণ সেগুলো তোমাকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।"[৪৮]

> "আর (নিজেদের মাঝে) ঝগড়া-বিবাদ কোরো না। তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি খর্ব হয়ে যাবে।"[৪৯]

আমাদের আজকের অবস্থায় কি তাহলে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব?

দুনিয়ার মোহ আর 'আমলে ঘাটতি

সালাহউদ্দীন হাত্তিনে জয়লাভ করেছিলেন পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং জেরুসালেমের মুক্তি নিয়ে সার্বক্ষণিক চিন্তা ফিকির থাকার কারণে। আর

[৪৮] সূরাহ আল-আন'আম ৬:৫৩
[৪৯] সূরাহ আল-আনফাল ৮:৪৫

আজকে ইয়াহুদীদের সাথে আমরা পরাজিত হচ্ছি কারণ কেবল হুমকি-ধমকি আর কথার ফুলঝুরি দিয়েই আমরা ফিলিস্তিন উদ্ধার করে ফেলতে চাই। ফিলিস্তিন ইশ্যু যখন থেকে তৈরি হয়েছে তখন থেকেই জনগণের আবেগ উথলে তোলার জন্য প্রচুর বক্তৃতা-সমাবেশ করা হয়েছে। জনগণ সরলমনে হাত তালি দিয়ে তাদের কথা বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু পরে আর কোনো গঠনমূলক ও সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে ওঠে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা বলো কেন? যা করা হয় না, তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর অপরাধ।"[৫০]

কবি বলেন;

লায়লার সাথে নাকি তার প্রেম এমনটাই সবাই বলে
অথচ লায়লা নিজেই তো তাকে সদা এড়িয়ে চলে।

ফিলিস্তিন সমস্যা দিন দিন বাড়ছেই। আজ এটা সমাধান হয় তো কাল আরেক সমস্যা মাথাচাড়া দেয়। এদিকে ইসরায়েল দিনকে দিন শক্তি-সামর্থ্য বাড়িয়ে চলেছে। মুসলিম উম্মাহ কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেওয়ার মতো সাহসই হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ হঠাৎ সমঝোতার কথা শোনা যায়। রজার'স প্রজেক্ট[৫১], অমুক সম্মেলন, তমুক সম্মেলন আরো কত কী! উদাহরণস্বরূপ, কিছু আরব রাষ্ট্র একসাথে কিছু পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে। ফিলিস্তিনি ফিদায়িনদের[৫২] নির্মূল করার মতো বিভিন্ন ইশ্যু সামনে এনে মূল সমস্যাকে একপাশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ আখেরে ইসরায়েলী আগ্রাসনের পক্ষেই সুফল বয়ে আনবে।

ইসরায়েলের জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বেশিরভাগ আরব শাসকই ফিলিস্তিন সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে গেছে এবং এর জন্য যথাযথ কুরবানি করেনি। যদি সত্যিই তাদের এ ব্যাপারে অগ্রহ থাকতো, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্য গলের

---

[৫০] সূরাহ আস-সফ ৬১:১-২
[৫১] ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল এবং মিশরের মধ্যকার যুদ্ধের অবসান লক্ষ্যে আমেরিকার তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী William P. Rogers ১৯৬৯ সালে একটি প্রস্তাব পেশ করেন যা 'রজার'স প্রজেক্ট' নামে পরিচিত। তার এই প্রস্তাবনা ব্যর্থ হলে তিনি ১৯৭০ সালে আরো একটি প্রস্তাব পেশ কররেছিলেন। - সম্পাদক
[৫২] ফিলিস্তিনি ফিদায়িন ইসরায়েল বিরোধী একটি গেরিলা সংগঠন। মূলত জাতীয়তাবাদী আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিলো ইসরায়েলি জায়োনিজমের মূলোৎপাটন করা এবং সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।– সম্পাদক

মতো করে সব বেশ্যালয়, ড্যান্স হল আর মদের বারগুলো বন্ধ করে দিতো। টেলিভিশনে অশ্লীল নাটক-সিনেমা ও গান-বাজনার প্রচার নিষিদ্ধ করতো। পাশাপাশি যুবসমাজকে সবরকম নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে সচেতন করে তুলতো। আমোদ-ফূর্তিতে ডুবে থাকা মুসলিম উম্মাহ আজ ভুলে গেছে আল আকসার সম্মানে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে। এই পৌরুষহীন জাতি কী করে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য আশা করে!

ভুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

হাত্তিনের যুদ্ধে মুসলিমদের জয়ের কারণ ছিলো আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার নিয়্যাতে লড়াই করা। আর আজকের পরাজয়ের কারণ হলো দলীয় চেতনা, খাহেশাত, পশ্চিমা আদর্শ, আর অনৈসলামী ভাবধারার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে নামা। কিছু শাসক যুদ্ধের আহ্বান করে বক্তৃতা দিয়েছে, অথচ আল্লাহ বা ইসলামের নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। কেবল অজ্ঞতা আর ফাঁকা জযবার মাধ্যমে জনগণকে উত্তেজিত করতে চেয়েছে।

১৯৪৮-এ যুদ্ধের আহ্বান করা হয় জাতীয়তাবাদের নামে।

১৯৫৬-তে যুদ্ধের আহ্বান করা হয় জাতীয়তাবাদের নামে।

১৯৬৭-তে যুদ্ধের আহ্বান করা হয় বিপ্লবী চেতনার নামে।

১৯৭৩-এ যুদ্ধের আহ্বান করা হয় আরবদের মান-মর্যাদার নামে।

মুশরিকদের কাল্পনিক উপাস্যগুলোর মতো এসব চেতনাও মানুষের মনগড়া।

আল্লাহ বলেন:

এগুলো তো কেবল কতগুলো নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছো। এর পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ

করেননি। তারা তো শুধু অনুমান আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, যদিও তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে।[৫৩]

এছাড়া আজকাল তো নাস্তিকীয় স্লোগান তুলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এদের আসল উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদেরকে তাদের মূল লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া। সেইসাথে কিছু লেখককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে আল্লাহ, ইসলাম ও নবী-রাসূল নিয়ে সংশয় তৈরি করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, এক জ্ঞানপাপী দালাল নাদিম আল-বিতার তার *মিনান নাকসাহ ইলাস সাওরাহ (স্থবিরতা থেকে বিপ্লবের দিকে)* নামক বইয়ে লিখেছে:

"দুনিয়া নাজাত পাবে বিপ্লবীদের মাধ্যমে। তাদেরকে ছাড়া আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে। বিপ্লবীরাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আর আল্লাহর দায়িত্ব গ্রহণকারী। কারণ আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে আল্লাহ এখন আর নেই। আমাদেরকে বরং তাঁকে সৃষ্টি করে নিতে হবে।"

আল্লাহ, তাঁর হুকুম-আহকাম ও নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে বুঝি বিজয় আসবে? নাকি এর মাধ্যমে এক স্থবিরতা থেকে আরেক স্থবিরতার দিকেই যাওয়া হবে কেবল?

এদের থেকে কী-ই বা আশা করা যায়?

আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এরাই কি ভবিষ্যতের ফিদায়ীন?

ফিলিস্তিন সেই নাস্তিক বিদ্রোহীদের হাতে মুক্ত হবে না!

আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি কুফরিকারীদের হাতে ফিলিস্তিন কখনো মুক্তি লাভ করতে পারে না!

মদ-মাদকের পথ অনুসরণকারীদের হাতে ফিলিস্তিন মুক্ত হবে না।

ড. ইউসুফ আল-কারাযাবী বলেন,

"যেসব সত্যিকারের মু'মিন রুকু-সেজদা করে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে, আল্লাহর হুকুমসমূহ তামিল করে, আর বিশুদ্ধ অন্তর ও শরীর নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, তাদেরকে ছাড়া অন্য কারো হাতেই

[৫৩] সূরাহ আন-নাজম ৫৩:২৩

ইসরায়েলের পতন ও ফিলিস্তিনের মুক্তি আসবে না। যখন আহ্বান করা হয়, 'হে জান্নাতি বায়ু! আমাদের দিকে এসো। হে আল্লাহর সাহায্য! দ্রুত এসো। হে কুর'আনওয়ালারা! কুর'আনের শিক্ষা বাস্তবায়ন কর।' তখন এরাই হবে আসল সৈনিক যাদেরকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না এবং কেউ তাদের সামনে টিকতে পারবে না। এরা বস্তুবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সংখ্যার ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে, শত্রুদের সংখ্যাকে পরোয়া করে না, বরং তাদের নিজেদের কাছে যা আছে তাতে আস্থা রাখে। পৃথিবী ছাড়িয়ে তাদের দিগন্ত গায়েবি জগতের আসমান ও শাহাদাতের দুয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা বিশ্বাস করে মানুষ যদি সাহায্যের হাত গুটিয়েও নেয়, আল্লাহই সাহায্য করবেন।

> "এবং ওয়ালী (অভিভাবক) হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।"[৫৪]

আর আল্লাহর সৈনিকেরা তাদের সাথে আছে।

> "তোমার রব্বের বাহিনীকে তিনি ছাড়া কেউই চেনে না।"[৫৫]

এরাই ইয়াহুদীদের হাত থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা। তাদের পরিচয় হলো ইসলাম, আল্লাহর ইবাদাতের চিহ্ন দেখে এদের চেনা যায় আর এদের স্লোগান হলো 'আল্লাহু আকবার!' রাসূল ﷺ এসব যোদ্ধাদের ব্যাপারে বলেন,

> কিয়ামাতের পূর্বে মুসলিমরা ইয়াহুদীদের সাথে লড়াই করবে। তারা (মুসলিমরা) এমনভাবে জয়লাভ করবে যে তারা (ইয়াহুদীরা) গাছ ও পাথরের আড়ালে লুকাবে। পাথর আর গাছেরা কথা বলে উঠবে, 'হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! আমার পেছনে এক ইয়াহুদী লুকিয়ে আছে। এসো একে হত্যা কর।'[৫৬]

সেসব মুসলিমকে জর্ডানিয়ান, সিরিয়ান, ফিলিস্তিনি বা এমনকি আরব বলেও ডাকা হবে না। কারণ তারা সেসব পরিচয় ছুঁড়ে ফেলে এক 'মুসলিম' পরিচয়কে

---

[৫৪] সূরাহ আন-নিসা ৪:৪৫
[৫৫] সূরাহ আল-মুদ্দাসসির ৭৪:৩১
[৫৬] সহীহ মুসলিম

গ্রহণ করেছে। যাদের উদ্দেশ্যে গাছ-পাথর কথা বলে উঠবে, তাদের পতাকা ইসলামের পতাকা, আর তাদের উদ্দেশ্য হলো এক আল্লাহর ইবাদাত। এরাই সেই আসল যোদ্ধা, যাদেরকে উম্মাহর প্রয়োজন, যারা ইয়াহুদীদের হত্যা করে ইসরায়েলি রাজ্য ধ্বংস করবে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এরা সেই মুসলিম যাদের হৃদয় আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ইয়াকীনে ভরপুর আর যারা আখিরাত পাওয়ার আশায় দুনিয়াবি সুখ পরিত্যাগ করে। তারা কোনো 'ভৌগলিক' মুসলিম নয় যে তার বাপের বংশীয় নামের মতো ইসলামকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে, যা তার কাছে জন্ম নিবন্ধন সনদের কিছু শব্দ মাত্র। আসল মুসলিম হলো আল্লাহর বান্দা। পেট, নারী, মদ, দুনিয়া, টাকা, বা ইয়াহুদীদের নিয়ম-নীতির বান্দা নয়। এসব জিনিসের বান্দারা না জয়ী হতে পারে, না ভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে পারে, না উম্মাহর ঝাণ্ডা বহন করতে পারে। তাদের মাধ্যমে বরং বিপর্যয় আর পরাজয়ই আসে।"[৫৭]

১৯৪৮ সালে ইয়াহুদীরা ইখওয়ানুল মুসলীমিনের হাতে পর্যুদস্ত হয়। মাত্র দুইশ জনের ছোট দল, সামান্য সরঞ্জাম আর অন্যদের বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও তারা অসাধ্য সাধন করে। তারা শহীদী তামান্নায় যুদ্ধে বের হয়। মুজাহিদীনের একজন বন্দী অফিসারকে এক ইয়াহুদী বলেছিলো, "ওই স্বেচ্ছাশ্রমিকদের দলটাকে ছাড়া আমরা কোনোকিছুকেই ভয় পাই না।" অফিসার জিজ্ঞেস করলেন তারা তাদের কোন জিনিসটাকে ভয় পাচ্ছে। সেই ইয়াহুদী বলে, "আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই ভূমিতে থাকার উদ্দেশ্যে এসেছি। আর তারা এখানে মরার উদ্দেশ্যে এসেছে।"

সর্বশেষ ১০ই রামাদ্বানের যুদ্ধে (৬ই অক্টোবর, ১৯৭৩, আমেরিকায় ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধ নামে পরিচিত) সিরিয়ান সেনাবাহিনীর কিছু মুমিন অফিসার ও মুসলিম সৈনিক নিজেদের বীরত্বের প্রমাণ দেন, শত্রুদের ক্ষতিসাধন করেন এবং জাতির জন্য আংশিক বিজয় নিয়ে আসেন। তাঁরা আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছেন, মহান ইসলামী নৈতিক শিক্ষা মেনে চলেছেন এবং অসাধারণ পৌরুষ দেখিয়েছেন।

অতএব, আল্লাহর উপর ঈমান, তাঁর কালেমাকে বুলন্দ করা, তাঁর রাহে কুরবানি

[৫৭] ড. ইউসুফ আল কারযাবী, দারস আন-নাকবাহ আত-তানিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৮৯

করা, এবং ইসলামের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করাই হলো বিজয়ের প্রথম ধাপ।

আজ মুসলিমদের যা অবস্থা, তাতে কি শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় আর আল্লাহর সাহায্য আশা করা যায়?

শুধুই আরবদের ব্যাপার?

হাত্তিনের বিজয়ের একটি কারণ হলো ফিলিস্তিনের সংকটকে পুরো মুলসিম উম্মাহর সংকট হিসেবে দাঁড় করানো। অপরদিকে আজকের পরাজয়ের কারণ হলো ফিলিস্তিন সংকটকে শুধুই আরবদের জাতীয় সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করা। প্রচারমাধ্যমে খালি আরব জাতীয়তাবাদের কথাই বলা হয়। আর বলা হয় যে, ইয়াহুদীদেরকে হটিয়ে ফিলিস্তিন মুক্ত করা কেবলই আরবদের দায়িত্ব।

এ কথার মাধ্যমে কি বিশ্বের ছয়শ মিলিয়ন মুসলিমকে অবজ্ঞা করা হলো না? অনারব মুসলিমরা কি মাসজিদুল আকসাকে তৃতীয় পবিত্রতম মাসজিদ বলে বিশ্বাস করে না? প্রথম কিবলাহ হিসেবে বিশ্বাস করে না? মি'রাজের স্থান হিসেবে বিশ্বাস করে না? শুধু এসবই না, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলেও বিশ্বাস করে।

জাতীয়তাবাদ আর আরবীয়বাদের নামে ইয়াহুদীদের সাথে লড়াই করার অর্থ হলো ইসলাম, মুসলিম ও ফিলিস্তিনিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, কারণ ইসলামের নামে যুদ্ধ করার বদলে আরব জাতীয়তাবাদের নামে যুদ্ধ করা হচ্ছে। মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, কারণ ইসলামী ভ্রার্তৃত্বকে আরব ভ্রার্তৃত্ব দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।"[৫৮]

[৫৮] সূরাহ আল-হুজুরাত ৪৯:১০

"নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মাহ একই উম্মাহ।"[৫৯]

এই দুই আয়াত মুসলিমদের মধ্যকার সত্যিকার বন্ধনের কথা বলে। আর তা হলো ইসলামের বন্ধন। রক্ত, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা ইতিহাসের বন্ধনের চেয়ে এই বন্ধনকেই ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। মুসলিমদের ইতিহাসে কখনো এই বন্ধনের সাথে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়নি, যা আমরা আজ করে চলেছি। মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে কখনো এভাবে ইসলামী ভ্রার্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয়নি।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, কারণ আরব জাতীয়তাবাদের আহ্বানকারীরা অনারব মুসলিমদেরকে এই কাজে শরিক হওয়া থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। তারা এই সংকটে অনারব মুসলিমদেরকে নাক গলাতে নিষেধ করে তাদের উপর যুলুম করেছে। এরকম ভেদাভেদ উস্কে দেওয়া আচরণ দেখার পর কি কখনো অনারব মুসলিমরা এই পবিত্র ভূমি মুক্ত করার কাজে শরিক হওয়ার আগ্রহ পাবে?

মুসলিমরা ইসলাম, ঈমান ও কুর'আন ছাড়া অন্য কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এরকম নজির সারা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

কবি সত্যই বলেছেন:

এক আহ্বানকারী ডাক দিয়ে দিয়ে বলছে
হতে চায় সে তার বাপ-দাদার বংশের সেরা,
তারা পড়ে আছে কাইস আর তামিম নিয়ে[৬০]
কিন্তু জেনো, আমার কোনো বাপ নেই ইসলাম ছাড়া।

আল-ঈমান তারিকুনা ইলান নাসর (ঈমান আমাদের বিজয়ের পথ) গ্রন্থে শেইখ মুহাম্মাদ নিমর আল-খতিব বলেন:

"আরব নেতারা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে ফিলিস্তিন সংকটকে শুধুই আরবদের নিজেদের ব্যাপার বলে প্রতিষ্ঠা করার। আমি জানি না

[৫৯] সূরাহ আল-আম্বিয়া ২১:৯২
[৬০] কাইস আর তামিম প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবের বিখ্যাত দু'টি গোত্রের নাম।

এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে। আমি বুঝতে পারছি না তারা কেন সাতশ মিলিয়ন[৬১] মুসলিমদেরকে গোনার মধ্যেই ধরছে না। অথচ এসকল মুসলিম ধনী ধনী দেশে বাস করে, তারা সোনা-রূপার মালিক। সব জাতিই চেষ্টা করে অন্য জাতির সাথে বন্ধুত্ব করার, অথচ আরব নেতারা করছে তার উল্টোটা। আমার মনে হচ্ছে তারা আরব বিশ্বে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের খুশি করতে চাইছে। 'যিশুর জন্মস্থান আর পুনরুত্থানের গীর্জা' যেই ফিলিস্তিনে অবস্থিত, সেখানে অবস্থানরত আমাদের ভাইদেরকে আমরা বাঁচাবো – এতে খ্রিষ্টানদের বিরক্ত হওয়ার কী আছে? পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করার জন্য অনারব মুসলিমরা আমাদের সাথে যোগ দিলে তাদের কী সমস্যা?"

ইসলাম ও আরব জাতীয়তাবাদের এই দ্বন্দ্বের কারণ হলো বর্তমান বিশ্ব এখন আর ধর্মের নামে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের ডাক দেওয়াকে ভালো মনে করে না। তার উপর ফিলিস্তিন সংকটকে যদি আমরা ইসলামী উপায়ে সমাধান করতে চাই, তাহলে তারা আমাদেরকে পশ্চাৎপদ, মধ্যযুগীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে কটাক্ষ করবে। তারা কি ভুলে গেছে যে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ইয়াহুদীবাদের ভিত্তিতে? দেশে-বিদেশে তাদের প্রোপাগান্ডাও ইয়াহুদীবাদের নামেই হয়ে থাকে।

ইয়াহুদী উইজম্যান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

"আমি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোরের সাথে দেখা করলাম। তিনি সেখানেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি উগান্ডায় আপনার নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে রাজি হলেন না কেন?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'জায়নিজম যদিও একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন, কিন্তু আমরা এর আধ্যাত্মিক দিকটা অস্বীকার করতে পারি না। আমি নিশ্চিত যে আমরা যদি ধর্মীয় দিকটিকে অবজ্ঞা করি, তাহলে আমরা আমাদের জাতীয় ও রাজনৈতিক স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হবো।"

[৬১] শাইখ আবদুল্লাহ নাসির উলওয়ানের এই বইটি প্রথম ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ২০১৭ সালের ২১ জানুয়ারী Pew Research Institute এর তথ্যমতে বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১.৮ বিলিয়ন।– সম্পাদক

১৮৯৭ সালে অনুষ্ঠিত বাসেল কনফারেন্সে[৬২] ইয়াহুদী হার্যল বলেন,

> "জায়নিজমে ফিরে যাওয়ার আগে ইয়াহুদীবাদের দিকে ফিরে যেতে হবে।"

প্রেসিডেন্ট দ্য গলকে লেখা এক চিঠিতে বেন গুইরন[৬৩] লেখেন,

> "ব্যাবিলনিয়ান আর রোমানদের হাতে দুটি পরাজয় আর খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে হাজার বছরের ঘৃণার পরও যে কারণে আমরা টিকে আছি, তা হলো পবিত্র গ্রন্থের উপর আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস।"

ইয়াহুদী নেতারা নিয়ম করেছে যে প্রাপ্তবয়স্ক সকল ইয়াহুদীকে এই শপথ নিতে হবে, "হে ইসরায়েল! এই আমার শপথ। আমি কসম করছি যে আমি ঈশ্বরের প্রতি, তোরাহ'র (তাওরাত) প্রতি, ইয়াহুদী জনগণের প্রতি ও ইয়াহুদী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবো।"

কনফারেন্স ফর ইন্টারন্যাশনাল জায়নিজম এর ২৫ তম অধিবেশনে (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬০) বেন গুইরন ঘোষণা করেন, "প্রত্যেক ইয়াহুদীর উচিত ইসরায়েলে হিজরত করা। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়ে যেসব ইয়াহুদী এই রাষ্ট্রের বাইরে বসবাস করছে, তারা তাওরাতের শিক্ষার বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করছে এবং প্রতিটি দিন ইয়াহুদী ধর্মের উপর কুফরি করে চলেছে।"

ইয়াহুদীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের চর্চার ফলাফল হলো

* রাষ্ট্রের নাম ইসরায়েল রাখা
* শনিবারে কাজকর্মকারীদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা
* সিভিল বিয়ের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না থাকা

---

[৬২] জায়োনিস্ট অর্গানাইজেশনের এটাই ছিলো প্রথম সম্মেলন যা ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়।– সম্পাদক

[৬৩] পুরো নাম ড্যাভিড বেন গুরিয়ন। জন্ম রাশিয়ায়। তিনি ইহুদীবাদী ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি 'বিশ্ব ইহুদীবাদী সংস্থা'র প্রধান নির্বাচিত হন- সম্পাদক

* নন-কোশার[৬৪] খাবার তৈরিকারী রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ করে দেওয়া
* প্রতিটি ইয়াহুদীকে বাধ্যতামূলকভাবে তাওরাত থেকে নিজের জন্য একটি নাম নির্ধারণ করার আদেশ করা

কিছুদিন পরই ইসরায়েলের গ্রান্ড রাবি নেসীম তালমুদকে ইসরায়েলের সংবিধান বানাতে চান। এর আগে এই রাষ্ট্রের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী তোরাহকে ইসরায়েলের সংবিধান বানাতে চেয়েছিলেন।

এমনকি এও জানা গেছে যে বিশাল একটা অংশ ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গোল্ডা মায়ারকে ভোট দেয়নি কারণ ইয়াহুদী ধর্মে নারীদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা নিষেধ।

আমাদের শত্রুরা তাদের মিথ্যা ধর্মের ডাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে। এমতাবস্থায় আমাদের কি উচিত আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামের অনুসারী হয়েও এর নামে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও যুদ্ধ করার ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া? ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে আগ্রহী লোকেরাও বিষয়টিকে আরবদের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলছে আর ছয়শ মিলিয়ন অনারব মুসলিমদেরকে বাদ করে দিচ্ছে। আরব জাতীয়তাবাদের নামে যুদ্ধ করা মুসলিমদের পক্ষে কি সম্ভব ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা?

এই হলো অতীতের ফিলিস্তিন আর বর্তমানের ফিলিস্তিনের মধ্যকার এক সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা। প্রতিশ্রুত বিজয় অর্জন করে নজির স্থাপন করতে ইচ্ছুকদের মধ্যে যাদের চোখ খোলা, তাদের উচিত পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করার শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া। নাজাত ও ইজ্জতের একমাত্র পথ ইসলাম।

> "আল্লাহ তাঁর কাজের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।"[৬৫]

---

[৬৪] কোশার আইন দ্বারা ইহুদিরা খাবার দাবারের উপর কিছু নিয়ম-নীতি তৈরি করে। এসব নিয়মের বাইরের কোন খাবার তারা অনুমোদন না দিতে বলে। এমনকি যারা তাদের এই নিয়ম মানে না তাদের রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলে। বিস্তারিত জানতে http://www.koshercertification.org.uk – সম্পাদক

[৬৫] সূরাহ ইউসুফ ১২:২১

অধ্যায় এগারো

সালাহউদ্দীনের চারিত্রিক গুণাবলি

আগের অধ্যায়গুলোতে সালাহউদ্দীনের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে, যার বেশিরভাগই তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক জীবন সংক্রান্ত। ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যই হলো রাজ-রাজড়াদের রাজনৈতিক জীবন আলোচনা করেই ক্ষান্ত দেওয়া। কিন্তু মুসলিম মনীষীগণ- হোন তিনি শাসক বা সাধারণ মানুষ– ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকেন তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলির কারণেও। সালাহউদ্দীনের এমনই কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচিত হলো।

ইবাদাত-বন্দেগী

নিঃসন্দেহে মুসলিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দ্বীনদারি, ইবাদাত, তাকওয়া, ঈমান, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি। আল্লাহর নিকটই সবকিছু চাওয়া এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমেই একজন মুসলিম সাহসী বীরের জন্ম হয়। সালাহউদ্দীন ছিলেন এমনই গুণে গুণান্বিত। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর আল-কাযী বাহাউদ্দীন ইবনু শাদ্দাদ তাঁর সীরাত সালাহউদ্দীন গ্রন্থে বলেন:

"তাঁর (রাহিমাহুল্লাহ) ঈমান ছিলো উত্তম এবং তিনি আল্লাহর অনেক যিকির করতেন। বড় বড় আলিম ও কাযিদের সাহচর্যে থেকে তিনি এসব গুণাবলি অর্জন করেন। যেমন, শেইখ কুতুবুদ্দীন আন-নাইসাবুরি তাঁর জন্য ঈমান-আকাঈদ সংক্রান্ত অনেক বিষয় একত্র করে দেন। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে শিশুকালেই পরম যত্ন নিয়ে এসব শিক্ষা দান করতেন ও মুখস্থ করাতেন। আমি তাঁকে তা শেখাতে দেখেছি এবং তাঁর সন্তানদেরকে দেখেছি তাঁর কাছে পড়া দিতে।

তিনি সঠিক ওয়াক্তে জামা'তের সাথে সালাত আদায় করতেন। তিনি সুন্নাতে

মুয়াক্কাদা ও সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা সালাতগুলোও নিয়মিত পড়তেন। কিয়ামুল লাইল করার জন্য শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠতেন, আর উঠতে না পারলে ফজরের আগে পড়ে নিতেন। মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতার সময়ও তাঁকে আমি দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে দেখেছি। জীবনের শেষ তিন দিনে অবচেতন হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সালাত ছাড়েননি। সফরের সময় সালাতের ওয়াক্ত হলে তিনি নেমে সালাত পড়ে নিতেন।

মৃত্যুর সময় তাঁর যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদও অবশিষ্ট ছিলো না। গরীব-দুখীদের জন্য তিনি দু হাত খুলে দান করেছেন। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ সাতচল্লিশ দিরহাম ও এক জুর্ম (খেজুরের বিচি সমান ওজনের মুদ্রা)। তিনি ঘরবাড়ি, বাগান, গ্রাম, খামার বা অন্য আর কোনো ধরনের সম্পত্তি রেখে যাননি।

রামাদ্বানের কিছু সওম তাঁর অসুস্থতার কারণে ছুটে গিয়েছিলো। মৃত্যুর বছরে জেরুজালেমে থাকা অবস্থায় তিনি সেগুলোর কাযা শুরু করেন। ডাক্তার তাঁকে এর কারণে তিরস্কার করেছিলেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি তো আমার তাকদির জানি না।' মনে হয় তিনি মৃত্যুর আগমন টের পাচ্ছিলেন।

তিনি হাজ্জ করার জন্য নিয়্যাত রেখেছিলেন এবং খুব করে তা চাইছিলেন। বিশেষ করে যে বছর তিনি মারা যান, সে বছর। কিন্তু সময় অনুকূলে ছিলো না। তাঁর হাতে যথেষ্ট অর্থ ও সময় ছিলো না। সকলে একমত যে, তিনি পরের বছর হাজ্জ করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ সে বছরই তাঁর তাকদিরে মৃত্যু রেখেছিলেন।

তিনি নিজে কুর'আন তিলাওয়াত করতেন এবং শ্রেষ্ঠ ক্বারিদের বেছে নিয়ে তাঁদের তিলাওয়াত শুনতেন। তাঁর অন্তর ছিলো নরম এবং প্রায়ই তিনি তিলাওয়াত করে বা শুনে কেঁদে দিতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ'র (ﷺ) হাদীসও শুনতেন। একজন উচ্চশিক্ষিত শাইখের কথা শুনে তিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়ে আনেন এবং তাঁর কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা করেন। অন্যদেরকেও তিনি এই দারসে আসার অনুমতি দেন।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে তিনি অনেক সম্মান করতেন। তিনি দার্শনিক ও বাতিল ফির্কাগুলোকে ঘৃণা করতেন। রাজ্যে কোনো যিন্দিক-মুলহিদের খবর

পেলে তিনি তাকে হত্যার আদেশ দিতেন।

তিনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী বা তাওবাহকারী ছিলেন। মুসলিমদের পরাজয়ের খবর পেলে তিনি সিজদায় পড়ে দু'আ করতে শুরু করতেন, 'হে আল্লাহ! আমার দুনিয়াবি আসবাব শেষ হয়ে গেছে। তাই আমি আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করতে ব্যর্থ হয়েছি। আপনার সাহায্য, আপনার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, আর আপনার রহমতের উপর ভরসা করা ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট, আর আপনি হলেন শ্রেষ্ঠ কর্মবিধায়ক।'

আল-কাযী বাহাউদ্দীন আরো বলেন,

> "আমি তাঁর অশ্রু গড়িয়ে তাঁর দাড়িতে, তারপর মাদুরে পড়তে দেখেছি। এমনকি তাঁর কথাও আর বোঝা যাচ্ছিলো না।" একই দিনেই তাঁকে বলা হয়েছিল যে মুসলিম সৈনিকেরা জয়লাভ করেছে। এছাড়া তিনি জিহাদকে এত ভালোবাসতেন যে, এটি তাঁর পুরো হৃদয়-মন-প্রাণ জুড়ে থাকতো। তিনি জুমু'আর দিনে যুদ্ধ করতেন যাতে হাদীসে বর্ণিত দু'আ কবুলের সেই স্বল্পস্থায়ী বিশেষ মুহূর্তে করা দু'আর সুযোগ নিয়ে তিনি জয়লাভ করতে পারেন।"

ন্যায়বিচার ও দয়া

আল-কাযী বাহাউদ্দীন বলেন:

> "তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও গরীবের বন্ধু। কাযি, বিচারক ও আলিমদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার তিনি সমাজের সবরকম মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতেন। যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব সবার। ঘরে থাকুন বা সফরে, এই কাজ থেকে তাঁর মুক্তি ছিলো না। তিনি বাদীর অভিযোগ

শুনে যত্ন নিয়ে তা সমাধা করতেন।”

তিনি আদালতে নিঃসংকোচে-নিরহংকারে তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে পাশাপাশি দাঁড়াতেন, যাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। ‘উমার আল-খাল্লাতি নামে এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে তার দাস সুঙ্কুর ও তার সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনে। বিচারক ইবনু শাদ্দাদের সামনে সে তার সাক্ষী নিয়ে আসে। সালালহউদ্দীন শান্ত থাকেন। তিনিও তাঁর সাক্ষী নিয়ে আসেন। উভয়পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। শেষে দেখা গেলো যে ব্যবসায়ী সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলো। কিন্তু মামলা জেতার পর সালাহউদ্দীন সেই ব্যবসায়ীকে কিছু মাল-সম্পদ উপহারস্বরূপ দিয়ে তাঁর দয়াশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

তিনি প্রজাদের অনেক যত্ন নিতেন এবং তাদের উপর চাপানো কিছু কর ও দায়িত্ব মওকুফ করে দেন। ইবনু জুবাইর উল্লেখ করেন যে, প্রজাদের জন্য সালাহউদ্দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলোর মধ্যে আছে বিক্রয় কর মওকুফ করা এবং নীলনদ থেকে পানি পানের উপর আরোপিত কিছু বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা।

মক্কা-মদীনার পুনঃনির্মাণ ও সেখানকার লোকেদের সাহায্য করার জন্য হিজাযগামী হাজ্জযাত্রীদের প্রত্যেকের উপর সাড়ে সাত দিরহাম কর আরোপ করা ছিলো। ফাতিমিরা এই কর আদায় করতে অনেক কঠোরতা অবলম্বন করতেন। যারা তা পরিশোধে ব্যর্থ হতো তারা চরম শাস্তি পেতো। সালাহউদ্দীন গরীব হাজ্জীদের উপর থেকে এই কর প্রত্যাহার করে নেন এবং হিজাযবাসীদেরকে এর সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে দেন। এভাবেই সালাহউদ্দীনের ন্যায়পরায়ণ শাসনাধীনে হাজ্জীগণ অনেক কষ্ট থেকে রক্ষা পান।

সাহস ও অবিচলতা

শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলে সালাহউদ্দীনের নজিরবিহীন সাহসিকতার কথা স্বীকার করতো। তিনি সেসব রাজা-বাদশাহ'র মতো ছিলেন না যাদের কাজ ছিলো সৈন্যদেরকে যুদ্ধ করার হুকুম দিয়ে নিজে দূর্গের ভেতর সুরক্ষিত থাকা। বরং তিনি সৈনিকদের সাথে প্রথম কাতারে থেকে সকল বিপদ-আপদ মোকাবেলায় অভ্যস্ত ছিলেন।

৫৮৪ হিজরিতে কাওকাব দূর্গ দখলের ঘটনায় তাঁর সাহসিকতার একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর ভাই আল-মালিক আল-'আদিলের নেতৃত্বাধীনে থাকা মিশরীয় সৈন্যদের জন্য তিনি ছুটি মঞ্জুর করেন। তিনি আস্কালন পর্যন্ত গিয়ে তাদেরকে বিদায় জানান। তাঁর পরিকল্পনা ছিলো এর পরে অ্যাকর পর্যন্ত উপকূলীয় শহরগুলো তদারক করা। তাঁর সহচররা এই পরিকল্পনার সাথে দ্বিমত করেন। কারণ মিশরীয় সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর তাঁর দেহরক্ষীর সংখ্যা স্বভাবতই কমে যায়। টায়ারে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক ক্রুসেডাররা আক্রমণ করে বসলে সামলানো কঠিন হয়ে যাবে। ইবনু শাদ্দাদ ও অন্যান্যরা তাই তাঁকে সেদিকে না যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি শত্রুদের অগ্রাহ্য করে মিশরীয় সৈন্যদের ছাড়াই অ্যাকরের দিকে যাত্রা করেন।

তখন ছিলো শীতকাল আর সাগর ছিলো উত্তাল। সাগরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ইবনু শাদ্দাদকে সালাহউদ্দীন বলেন, "আল্লাহ যদি আমাকে উপকূলের বাকি অংশগুলো জয় করার তাওফিক দেন, তাহলে আমি শহরগুলো (আমার ছেলেদের মাঝে) ভাগ-বাটোয়ারা করে দেবো। তারপর আমার উইল লিখে আপনার হাতে দিয়ে জাহাজে করে ক্রুসেডারদের দ্বীপগুলোতে চলে যাবো, যাতে কুফফারদের সব দলগুলোকে পরাস্ত করতে পারি অথবা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যেতে পারি।"

বিপদ-আপদের মোকাবেলায় তিনি ছিলেন শান্ত, সুস্থির ও অবিচল প্রত্যয়ী। আল-কাযী ইবনু শাদ্দাদ বর্ণনা করেন:

> "ক্রুসেডারদের অ্যাকর অবরোধের সময় এক রাতেই ক্রুসেডারদের সত্তরটি জাহাজ অ্যাকরে পৌঁছায়। তিনি 'আসরের পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেগুলো গুনলেন। কিন্তু তাঁকে ভীত দেখায়নি, বরং তিনি আরো সাহস অনুভব করেন। আমি কখনো শত্রুর সংখ্যা বা শক্তির কারণে তাদেরকে ভয় পেতে দেখিনি।"

অ্যাকরে ক্রুসেডারদের সাথে একটি যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজিত হয় এবং তাদের মানের অবনতি দেখা যায়। কিন্তু সালাহউদ্দীন অবিচল থেকে সৈনিকদের একটি ছোট দল সহ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে আবার যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয় অর্জন করে ছাড়েন।

আরেক ঝড়-বাদলের দিনে অ্যাকরে অবস্থানকালে তাঁর উপর তাঁবু ভেঙে পড়ে। এতে তিনি মারাও যেতে পারতেন। এ ঘটনায় তাঁর জিহাদের ক্ষুধা বরং বেড়ে যায়। এ থেকেই তাঁর জীবনীশক্তি, আল্লাহর উপর আস্থা ও সাহসিকতার প্রমাণ মেলে।

আল-কাযী বাহাউদ্দীন তাঁর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র আগ্রহের বর্ণনায় বলেন:

> "তিনি জিহাদকে এতই ভালোবাসতেন যে, এটি তাঁর মন, মুখ ও হাত জুড়ে থাকতো। সৈন্য, গোলাবারুদ আর জিহাদপ্রেমীদের নিয়েই ছিলো তাঁর দিনকাল। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য তিনি তাঁর পরিবার ও স্বদেশ থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকেন। ঝড়-ঝঞ্ঝায় পতনশীল তাঁবুর নিচে বাস করেই তিনি ছিলেন সন্তুষ্ট। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি বেশ কয়েকবার সৈনিকদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হন।"

ইবনু শাদ্দাদের এহেন বিস্ময়ভাব দেখে সালাহউদ্দীন তাঁকে বলেছিলেন,

> "লড়াই শুরু করলেই আমার অসুস্থতা কেটে যায়।"

ইবনু শাদ্দাদের বর্ণিত আরেকটি ঘটনা থেকে সালাহউদ্দীনের ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টির কথা জানা যায়। সালাহউদ্দীনের এক ছেলের নাম ছিলো ইসমা'ঈল। তাঁকে

ইসমা'ঈলের মৃত্যুর সংবাদ দিলে তিনি ভেঙে না পড়ে ধৈর্য ধরেন এবং আল্লাহর নিকট এই কুরবানির প্রতিদানের আশা রাখেন। শুধু তাঁর চোখ দুটি অশ্রুতে ভিজে যায়। ইবনু শাদ্দাদ বলেন, "হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ধৈর্য ও কুরবানির পথ দেখিয়েছেন। তাঁকে এর প্রতিদানও দিন, ইয়া রাহমান!"[৬৬]

সমঝোতা ও ক্ষমাপরায়ণতা

সালাহউদ্দীনের উল্লেখযোগ্য গুণ হলো তাঁর ক্ষমাশীলতা ও ঝামেলা মিটমাট করে ফেলার ক্ষমতা। তিনি অসদাচরণের জবাব দিতেন সদাচরণের মাধ্যমে আর কর্কশ স্বভাবের জবাব দিতেন ধৈর্যের মাধ্যমে। ইবনু শাদ্দাদ বর্ণনা করেন যে, আদালতে মানুষ এত ভিড় করতো যে সালাহউদ্দীনের কাপড়ের ঝুলে মানুষ পাড়া দিয়ে দিতো। অথবা তিনি যে মাদুরে দাঁড়াতেন, সেখানে উঠে আসতো। কিন্তু তিনি এতে কিছু মনে করতেন না। অনেক মামলার বাদী তাঁর সাথে রূঢ়ভাবে কথা বলতো, কিন্তু তিনি তাদের কথা মেনে নিতেন।

এক বৃষ্টির দিনে ইবনু শাদ্দাদ খচ্চরের পিঠে চড়ে সালাহউদ্দীনের পাশ দিয়ে গেলেন। ঠিক এই সময় খচ্চরটি গা ঝাড়া দিলো। ফলে কাদার ছিটা গিয়ে সালাহউদ্দীনের কাপড়ে লাগলো। কিন্তু সালাহউদ্দীন ইবনু শাদ্দাদকে বিব্রত হতে না দিয়ে হাসি দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন।

সালাহউদ্দীনের ক্ষমাপরায়ণতার আরেকটি ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী হন ইবনু শাদ্দাদ। ইয়াফফা নিয়ে যখন সালাহউদ্দীন আর রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্টের মধ্যে ঝামেলা চলছিলো, তখন কিছু সৈনিক সালাহউদ্দীনের নির্দেশ অমান্য করে তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করে। তিনি রাগ করে চলে গেলেন। অন্য সৈনিকেরা তাঁর রাগ দেখে ভাবলো তিনি হয়তো ওইসব সৈনিককে তাদের আচরণের কারণে হত্যাই করে ফেলেছেন। সালাহউদ্দীন হেডকোয়ার্টারে গিয়ে সভাসদদের সাথে

[৬৬] আন-নাওাদির আস-সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা ৫০

কথা বলার সময় সবাই এতই ভয় পাচ্ছিলেন যে, মনে হচ্ছিলো তিনি তাঁদের উপরও রেগে আছেন। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ইবনু শাদ্দাদও বলেছেন, "আমার ভয় হচ্ছিলো যে তিনি আমাকে না আবার ডাক দিয়ে বসেন।" কিন্তু তিনি সালাহউদ্দীনের কক্ষে যাওয়ার পর তাঁকে শান্ত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ইবনু শাদ্দাদকে বলেন সভাসদদেরকে ডাকিয়ে আনতে। দামেস্ক থেকে কিছু ফল এসেছে, তা সবাই মিলে খাওয়ার জন্য ডাকতে বললেন সবাইকে। সভাসদরা ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে সালাহউদ্দীনকে হাসিখুশি পেলেন। কিছুই যেন হয়নি এমন বোধ নিয়ে তাঁরা আবার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ইতিহাসবিদরা আরো বর্ণনা করেছেন যে, একবার সালাহউদ্দীন ক্লান্ত থাকা অবস্থায় এক লোক তাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে। তিনি বলেন যে তিনি ক্লান্ত আছেন, পরে দেখে দিবেন। কিন্তু লোকটি অপেক্ষা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সেখানেই অভিযোগটি পড়ে শোনায়। সালাহউদ্দীন তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। লোকটির পড়া শেষ হলে তিনি বলেন যে অভিযোগপত্রটি স্বাক্ষর করার জন্য তাঁর কাছে কালির দোয়াত নেই। লোকটি গিয়ে কালি এনে দেয়। সালাহউদ্দীন একটুও না রেগে নীরবে অভিযোগপত্রটি সই করে দেন।

তিনি শুধু নিজের প্রজা, অনুসারী আর সৈনিকদের প্রতিই ক্ষমাশীল ছিলেন, তা নয়। শত্রুদের সাথেও তিনি ক্ষমাশীল আচরণ করতেন। সপ্তম অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সৌজন্য ও মহানুভবতা

ইতিহাসবিদরা একমত যে, যুদ্ধ আর রাজ্যজয়ের ইতিহাসে সালাহউদ্দীনের মতো সৌজন্য, মহানুভবতা আর শত্রুদের প্রতি সদাচরণের নজির একেবারে বিরল।

ইবনু শাদ্দাদ বলেন:

> "একবার আমরা শত্রুসীমা ঘেঁষে হাঁটছিলাম। এক মুসলিম সৈনিক একজন ক্রুসেডার নারীকে সাথে নিয়ে এলো। মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বুক চাপড়াচ্ছিলো। সালাহউদ্দীন এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে মহিলাটি তার ছোট্ট মেয়েকে হারিয়ে ফেলেছে। সালাহউদ্দীনের দয়া হলো ও চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি আদেশ দেন যে সেই মেয়েকে খরিদ করেছে, তাকে যেন তলব করা হয়। তারপর তাকে মূল্য পরিশোধ করে যেন মেয়েটিকে মুক্ত করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনা হয় আর তার মা তার দিকে দৌড়ে যায়। সে মুখে ধুলাবালি মেখে কাঁদতে থাকে। মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে তার মেয়েকে নিয়ে তাদের শিবিরে ফিরে যায়।"

ইবনু শাদ্দাদের বর্ণিত আরেকটি ঘটনা থেকে সালাহউদ্দীনের সৌজন্য ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত দেখা যায়:

> "সালাহউদ্দীনের চরম শত্রু ইংলিশ রাজা রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্ট যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন সালাহউদ্দীন তাঁর খোঁজ-খবর নেন এবং তাঁর জন্য ফলমূল ও বরফ পাঠান। ক্ষুধার্ত ক্রুসেডাররা শত্রুর কাছ থেকে এমন মহানুভব আচরণ পেয়ে একেবারে তাজ্জব বনে যায়।"

ইতিহাসবিদগণ একমত যে, সালাহউদ্দীন ক্রুসেডারদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। আদ-দা'ওয়াহ ইলাল ইসলাম গ্রন্থে আর্নল্ড[৬৭] বলেন, "বিপুল সংখ্যক ক্রুসেডার সালাহউদ্দীনের দয়ালু আচরণ দেখে ইসলাম গ্রহণ করে।"

ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের অন্ধ ঘৃণা আর খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলিমদের ইসলামী সৌজন্যমূলক আচরণে ব্যাপক ফারাক। ক্রুসেডাররা ক্রোধে অন্ধ হয়ে

---

[৬৭] পুরো নাম থমাস ওয়াকার আরনল্ড। তিনি স্যার আহমেদ খানের খুব কাছের লোক ছিলেন। কবি আল্লামা ইকবালের দ্বারা প্রভাবিত এই ওরিয়েন্টালিস্ট এবং ইসলামি ইতিহাসবিদ উপমহাদেশের আলেম আল্লামা শিবলী নুমানিরও সঙ্গ পেয়েছেন। *The preaching of Islam: a history of the propagation of the Muslim faith* তার লেখা একটি বিখ্যাত বই।– সম্পাদক

আক্রমণ করে নারী-শিশু-বৃদ্ধ সবার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের নৃশংসতার বলি হয় মাসজিদুল আকসায় আশ্রয় নেওয়া সত্তর হাজার মুসলিম নারী, শিশু আর বিকলাঙ্গ। পক্ষান্তরে সালাহউদ্দীন জেররুসালেম জয় করার পর ক্রুসেডারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, তাদের উপর যুলুম হওয়ার আশংকা রোধ করেন, তাদের থেকে মুক্তিপণ কবুল করেন। শুধু তা-ই না, মুসলিম সৈনিকদের তত্ত্বাবধানে তাদেরকে টায়ারেও পৌঁছে দিয়ে আসা হয়।

সালাহউদ্দীনের সমালোচনা

আধুনিক ইতিহাসবিদগণ সালাহউদ্দীনের বিভিন্ন নীতিমালা, বিশেষ করে ইসলামের শত্রুদের প্রতি অতিরিক্ত সৌজন্যমূলক আচরণের সমালোচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো:

১.

সালাহউদ্দীনের উচিত ছিলো ক্রুসেডারদের আচরণের সমুচিত জবাব দেওয়া। তারা যেভাবে মুসলিম বন্দীদের হত্যা করেছে, তাদের বন্দীদেরকেও সেভাবে হত্যা করা।

> “অন্যায়ের প্রতিবিধান হলো অনুরূপ অন্যায়।”[৬৮]

> “কাজেই যে কেউ তোমাদের সাথে কঠোর আচরণ করে, তোমরাও তার প্রতি কঠোর আচরণ কর যেমন কঠোরতা সে তোমাদের প্রতি করেছে।”[৬৯]

২.

তিনি ক্রুসেডার বন্দীদেরকে টায়ারে স্থায়ী হতে দিয়েছেন। এর ফলেই তারা

[৬৮] সূরাহ আশ-শুরা ৪২:৪০
[৬৯] সূরাহ আল-বাকারাহ ২:১৯৪

ইউরোপ থেকে রসদ-সাহায্য আনিয়ে তৃতীয় ক্রুসেড শুরু করতে সমর্থ হয় এবং অ্যাকর দখল করে বসে।

৩.

হাত্তিন যুদ্ধের পর যেসব বিপর্যয় ঘটে, সেগুলো পূর্ব-পশ্চিমে মুসলিমদের জয়যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে।

তবে অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ সালাহউদ্দীনের কাজগুলোকে সমর্থন করে বলেছেন যে, এরকম দয়ালু আচরণ ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করেই করা হয়েছিলো। বন্দীদেরকে হত্যা ও বন্দী করেও রাখা যায় আবার মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়েও দেওয়া যায়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কোন পদক্ষেপটি সবচেয়ে লাভজনক হবে, সেই ইজতিহাদ করার অধিকার মুসলিম শাসক বা নেতার রয়েছে।

> "অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর অথবা তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে।"[৭০]

এছাড়া সালাহউদ্দীন তো যাজক-সেবক মিলিয়ে প্রায় দুইশ মতো বন্দীকে হত্যা করেছেনই। এরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, প্রোপাগান্ডা আর চুক্তিভঙ্গ করার মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে ঝামেলা বাঁধানোর চেষ্টা করছিলো। আর এরাই ছিলো সব নষ্টের গোড়া। এদের বিশাল অনুসারী গোষ্ঠী ছিলো এবং তারা চরমভাবে মুসলিমবিরোধী ছিলো।[৭১] এছাড়া আগেও বলা হয়েছে যে রাসূলকে ﷺ গালিগালাজকারী কেরাকের শাসক রেজিনাল্ড অব শ্যাতিওনকে হত্যা করে সালাহউদ্দীন তাঁর কসম পূর্ণ করেছেন।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, যেখানে কঠোরতা দরকার হতো সেখানে সালাহউদ্দীন কঠোরতা দেখাতেন। আর যেখানে মহানুভবতার দরকার হতো, সেখানে তিনি মহানুভবতা দেখাতেন। এক কবি লিখেছেন:

---

[৭০] সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:৪
[৭১] হায়াতু সালাহউদ্দীন, আহমাদ আল-বায়ালি, পৃষ্ঠা ১৬২

যেথায় কোমল হতে হয় সেথা যাবে না কঠোর হওয়া,
আবার কঠোর হতেই হলে যাবে না কোমলতা সওয়া।

আর টায়ারে থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে বলা যায় যে, এখানে তো চুক্তি করেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। সালাহউদ্দীনের দয়ালু আচরণ দেখে তারা এই চুক্তিকে সম্মান করবে, মুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করবে, এমন আশা করাটা তো অন্যায় নয়। কিন্তু তারা সেই ইহসানের কথা ভুলে যায়। এক আরব কবি বলেন:

মানুষ যা চায়, ঠিক তা-ই কি সবসময়ই হয়?
জাহাজের ঠিক উল্টো দিকেও প্রবল বায়ু বয়।

তবে সালাহউদ্দীন যদি তাদের থাকার জায়গাগুলোকে ভেঙে ভেঙে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতেন, তাহলে হয়তো তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এভাবে আক্রমণ চালানোর কথা ভাবতে পারতো না। কিন্তু তাঁর হাতে তো আর গায়েবের চাবিকাঠি নেই যে আগে থেকেই তৃতীয় ক্রুসেডের কথা জেনে যাবেন।

অতীত গিয়েছে অতীত হয়ে, ভবিষ্যতও তো গায়েব,
বর্তমানের জীবন নিয়েই বেশি করে ভাবুন, সায়েব!

শেষ কথা হলো, তিনি নবীগণের মতো মাসুম ছিলেন না। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যিনি কবরে শায়িত (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ), তিনি ছাড়া উম্মাতের যে কেউই ভুল করতে পারে।" মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্তের কারণে এক নেকি পায়, আর সঠিক হলে দুই নেকি। সালাহউদ্দীন যে দলেই পড়ুন, ইনশাআল্লাহ তিনি পুরস্কৃত হবেন।

কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা

সালাহউদ্দীন আসলে একজন সুসংহত মানুষ ছিলেন। তাঁর মন সবসময় জিহাদের কথা ভাবতো বটে, কিন্তু তাই বলে তিনি হালাল বিনোদন উপভোগ করতে ভুলেননি। ইবনু শাদ্দাদ বলেন যে, সালাহউদ্দীন ছিলেন মিশুক, নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন, সেই সাথে রসবোধসম্পন্ন। তিনি আরবদের বংশলতিকা, যুদ্ধের তালিকা, তাদের জীবনী, তাদের ঘোড়াগুলোর কুলুজি এবং গল্প-উপকথা মুখস্থ জানতেন।

তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের একটি প্রমাণ ছিলো তাঁর মুখস্থ থাকা কবিতাগুলো। আর এগুলো তিনি প্রায়ই কথায় কথায় আওড়াতেন। ইবনু খালিকান তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সালাহউদ্দীন ভালো মানের কবিতা আর বাজে কবিতার মাঝে পার্থক্য জানতেন। অনেক কবি তাঁর কাছে এসে স্বরচিত কবিতা শোনাতো।

তিনি প্রায়ই এক কবির কবিতা আবৃত্তি করতেন:

বিপদের মাঝেও প্রিয়তমাকে স্বপ্নে দেখি
সোৎসাহে সব জাগিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি প্রায়,
রাত কেটে গিয়ে ভোর হয়ে গেলো, এ কী!
স্বপ্ন ভেঙে আমার আনন্দ দুঃখ হয়ে গেলো, হায়!

ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান এর লেখক বলেন যে, ইবনুন মুনাজিমের এই কথায় সালাহউদ্দীন সন্তুষ্ট ছিলেন:

পাকা চুল দেখতে খারাপ লাগে, তাই কলপ মাখে লোকে,
চুল বড় হয়ে পাকা মূল বেরোলে আরো বিশ্রী লাগে চোখে।
যৌবনের মৃত্যুতে চুল জেনো সব কালো হয়েছিলো শোকে।

রাওদাতাইন এর লেখক উল্লেখ করেছেন যে, সালাহউদ্দীন ছিলেন উসামা ইবনু মুনকিযের কবিতার ভক্ত। হৃদয়কাড়া অনেক কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিলো। ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করেন যে, তাঁর ভাই তুরান শাহ'র মৃত্যুর পর তিনি শোককবিতা আবৃত্তি করে তাঁর দুঃখ প্রকাশ করেন। আল-'ইমাদ আরো বলেন, তিনি বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখে কোনো সুসংবাদ দেওয়ার সময় চরণ আকারে লিখতেন:

একদা তোকে স্বচোখে দেখেও মেটেনি মনের সাধ
আজ শুধু তোর খবর শুনেই খুশি মানে না বাধ।

আল-'ইমাদ আল-কাতিব আরো বলেন যে, সালাহউদ্দীন সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের ভক্ত ছিলেন। কবিদের সাথে দেখা করে তাদের নতুন নতুন কবিতা শুনতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, জেরুজালেম বিজয়ের পর তিনি এমন একটি সভা করে কবিতা আবৃত্তি শোনেন। সপ্তম অধ্যায়ে এমন কিছু কবিতা উল্লেখিত হয়েছে।

সালাহউদ্দীন ছিলেন দক্ষ কাব্য সমালোচক। সেখানকার বিখ্যাত খুবানি ফলের মৌসুমে আল-'ইমাদকে দামেস্কে দাওয়াত দিয়ে আহমাদ ইবনু নাফাদাহ একটি কবিতা লিখেছিলেন। তার শুরুতে ছিলো:

সুস্বাদু সব খুবানি ফলের দাওয়াত যখন আসে
দামেস্ক ছাড়া আর কোথাকার ছবি না মনে ভাসে।

আল-'ইমাদ সেটি সুলতান সালাহউদ্দীনকে দেখালে সালাহউদ্দীন জানতে চান এর জবাবে তিনি কী লিখেছেন। আল-'ইমাদ বলেন:

দস্তরখানে বসি চলো গিয়ে, খুবানি ফল নিয়ে খাই,
রূপায় জড়ানো সোনা যেন তা, চোখ ফেরাতে না পাই।

সুলতান তা শুনে বললেন, "পাতার সাথে রূপার তুলনাটা মিললো না। পাতা হলো সবুজ, আর রূপা তো সাদাটে।" আল-'ইমাদ এরপর সংশোধন করে লিখলেন:

পাতার ভেতর খুবানি যেন পান্না মোড়ানো সোনা,
কবির উপমা ভুল হলো বলে সুলতানের সমালোচনা।

আত্মসংযম ও দানশীলতা

তিনি দুনিয়াবি সুখ-সম্ভোগ থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করতেন। তাঁর অনুসারীরা তাঁর জন্য দামেস্কে এক আলিশান বাড়ি বানায়। তিনি এর পরোয়াই না করে বললেন, "এই ঘরে আমরা চিরকাল থাকবো না। শাহাদাত পিয়াসীদের জন্য এ ঘর শোভনীয় নয়। এখানে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগি করতে এসেছি।"[৭২]

ক্ষমতা-কর্তৃত্ব নিয়ে তিনি অহংকার করতেন না। তাঁর একটি উক্তি এমন, "আমার চোখে অর্থ-সম্পদ আর ধূলাবালি একই জিনিস।" তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) কোনো টাকা, জমি বা প্রাসাদ রেখে মারা যাননি। ইবনু শাদ্দাদ উল্লেখ করেছেন, "মৃত্যুর সময় তাঁর যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদও অবশিষ্ট ছিলো না। গরীব-দুখীদের জন্য তিনি দু হাত খুলে দান করেছেন। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ সাতচল্লিশ দিরহাম ও এক জুর্ম (খেজুরের বিচি সমান ওজনের মুদ্রা)। তিনি ঘরবাড়ি, বাগান, গ্রাম, খামার বা অন্য আর কোনো ধরনের সম্পত্তি রেখে যাননি।"

এমন শাসকের সংখ্যা ইতিহাসে শূন্যের কোঠায়। সুলতান আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখের বিনিময়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখকে বিকিয়ে দিয়েছেন।

তিনি ভিক্ষুক ও অভাবীদেরকে দান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। ইবনু শাদ্দাদ বলেন:

"তিনি যখন দামেস্কের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, জেরুসালেমে তাঁর বাসস্থানে অভাবীরা জড়ো হলো। কোষাগারে যথেষ্ট টাকা ছিলো না। আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি কোষাগারের কিছু জিনিস বিক্রি করে তাদেরকে দান করার ব্যবস্থা করলেন। সংকট ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থায় তিনি দানশীল

[৭২] হায়াতু সালাহউদ্দীন, আহমাদ আল-বায়ালি, পৃষ্ঠা ২১৪

ছিলেন। কোষাধ্যক্ষরা বিশেষ প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কিছু সম্পদের হিসাব তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতেন। সালাহউদ্দীন বলতেন, 'এমনও মানুষ আছে যাদের কাছে টাকাপয়সা আর ধূলাবালি একই জিনিস।' হয়তো তিনি নিজেই এমন এক লোক ছিলেন।"

আলিম ও তাসাউফ চর্চাকারীদের প্রতিও তিনি উদার ছিলেন। অন্যদেরকেও তাঁদের প্রতি উদার হতে নির্দেশ দিতেন। একবার একজন আলিম সূফি তাঁর পাশ দিয়ে যান। এর কিছুদিন পর তিনি সে এলাকা থেকে চলে যান। সালাহউদ্দীন তাঁর খবর জানতে চাইলে তাঁকে জানানো হলো যে তিনি চলে গেছেন। সুলতানের চেহারায় অসন্তোষ ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, "তিনি চলে যাওয়ার আগে কোনো দান-সদকা কেন করা হলো না তাঁকে?" সেই আলিমের পরিচিত এক কেরানিকে দিয়ে সুলতান খবর পাঠালেন যেন তিনি ফিরে এসে সুলতানের সাথে দেখা করেন। তিনি আসার পর সুলতান তাঁকে স্বাগত জানান, তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন এবং কয়েকদিনের জন্য তাঁকে অতিথি হিসেবে রাখেন। সুলতান তাঁর কাছে তাঁর পরিবার ও প্রতিবেশীদের জন্য উপঢৌকন, টাকা, সওয়ারি জন্তু ও কাপড় দেন। সূফি সাধকটি খুশি মনে প্রস্থান করেন।

সম্পদ আসার খবর পেলে তা হাতে এসে পৌঁছাবার আগেই সালাহউদ্দীন অভাবী ও সৈনিকদেরকে দান-সদকা করতে শুরু করতেন। যুদ্ধে কারো ঘোড়া আহত হলে তিনি সেটি বদলে সুস্থ ঘোড়া দিতেন। তাঁর নিজের নির্দিষ্ট কোনো ঘোড়া ছিলো না। তিনি সৈনিক ও জনগণকে ঘোড়া সদকা বা হাদিয়া হিসেবে দিতেন। এভাবে প্রায় দশ হাজার ঘোড়া তিনি দান করেন। এছাড়া তিনি লিনেন, সুতি ও পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন। কোনো অভাবীর খবর পেলে তা দানও করে দিতেন।[৭৩]

এমন দানশীলতার কারণ হলো তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডাক পাওয়া সৈনিক ছাড়া নিজেকে আর কিছুই ভাবতেন না। এছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যখন-তখন মৃত্যু চলে আসতে পারে। তাহলে প্রকৃত অভাবী লোকদেরকে বঞ্চিত করে নিজের কাছে টাকা জমিয়ে রাখার কী দরকার? এছাড়া তিনি দুনিয়াবি বিলাসিতা পরিহার করতেন। প্রতিনিধিদেরকে কাজে পাঠিয়ে

নিজে সিংহাসনে বসে আয়েশ করতেন না। আয়েশী রাজার বদলে তিনি ছিলেন এক কঠোর পরিশ্রমী যোদ্ধা। বিশ্রাম নেওয়ার দরকার পড়লে তিনি মেঝোতে বা সামান্য তাঁবুর ছায়ায়ই বিশ্রাম নিতে জানতেন। মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও মর্যাদার আসনে আসীন দেখেই তিনি প্রশান্তি পেতেন।

জিহাদপ্রেম

দখলদার ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে উদ্ধার করার জন্য সালাহউদ্দীন নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করেছেন।

ইবনু শাদ্দাদ আরো বলেন:

> "জিহাদের প্রেমে তিনি ছিলেন পাগলপারা। একে তিনি এতই ভালোবাসতেন যে প্রতিটি সভায় এ প্রসঙ্গ তুলতেন। তিনি শুধুই তাঁর সৈনিক, সরঞ্জাম, এবং উপদেশ-নসিহতকারীদের ভালোবাসতেন। স্ত্রী-সন্তান, জন্মভূমি ছেড়ে এমন তাঁবুর নিচে বাস করতেন, যা বাতাসে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হতো। একবার তিনি তাঁবুর বাইরে থাকা অবস্থায় তাঁর তাঁবু ভেঙে পড়ে। কিন্তু এতে তাঁর জিহাদস্পৃহা বেড়েছে বৈ কমেনি।"

সালাহউদ্দীনের এসব গুণাবলি আমাদের আজকের শাসকদের মাঝে আরো বেশি করে দরকার। তাহলেই তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইসরায়েলকে ধ্বংস করে উম্মাহর গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে। আল্লাহ চাইলে কিছুই অসম্ভব নয়।

মুসলিম উম্মাহর আজ এমন এক নেতার বড়ই প্রয়োজন যার মাঝে দ্বীনদারি, ন্যায়পরায়ণতা, দয়াশীলতা, সাহসিকতা, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, সৌজন্য, মহানুভবতা, আত্মসংযম, দানশীলতা, কর্মঠতার সমাহার ঘটে। শাসক বা নেতার

মাঝে এসব গুণ থাকলেই কেবল ইসলামের গৌরব পুনরুদ্ধার সম্ভব।

কত শত পথে ভাগ হয়ে গেছে হায় মোদের হৃদয়গুলো,
রব্বের কাছে যে দু হাত তুলে আজ দু'আর সময় এলো!
হে আল্লাহ! দাও সে শাসক, ইসলামের তরে যে কুরবান,
মুসলিমদের প্রতি সে আর তার প্রতি তুমি থাকবে মেহেরবান।

অধ্যায় বারো

সালাহউদ্দীনের করা সংস্কার কাজসমূহ

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি যে সালাহউদ্দীন তাঁর প্রায় পুরো জীবনই ব্যয় করেছেন অযোগ্য মুসলিম বাদশাহদের অপসারণ সংগ্রাম ও হানাদার ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিদ্ধংসী জিহাদ করে। এ কারণে বড় কোনো গঠনমূলক জনকল্যাণ পদক্ষেপ গ্রহণ তাঁর জন্য কঠিন ছিলো। তারপরও তিনি এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাজ করে গেছেন যার সুফল পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করেছে। এই অধ্যায়ে সুলতানের সংস্কার প্রকল্পগুলোর মধ্যে কয়েকটি আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

নির্মাণ সংস্কার

কায়রোর প্রাচীর পুনর্নির্মাণ ছিলো এই ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেয়ালটি অনেক জায়গায় ধসে গিয়ে চোরারাস্তায় পরিণত হয়েছিলো। এগুলো দিয়ে আইনের চোখ এড়িয়ে মানুষ অবাধে কায়রোর ভেতরে-বাইরে যাতায়াত করতে শুরু করেছিলো। নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সালাহউদ্দীন নিয়োগ করেন আত-তাওয়াশি বাহাউদ্দীন কারাকুসকে। প্রাচীর ২৯.৩০২ কিউবিট দীর্ঘ ছিলো এবং পুরো শহরটিকে বেষ্টন করে রেখেছিলো। 'আমর বিন আল-'আস (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল-ফুস্তাত, সালিহ ইবনু 'আলী আল-'আব্বাসির প্রতিষ্ঠিত আল-'আসকার এবং জাওহার আস-সাকিল্লির প্রতিষ্ঠিত আল-কাহিরাহ শহর মিলে ছিলো তখনকার কায়রো। আক্রমণকারীদের হাত থেকে কায়রোকে সুরক্ষিত করা হয়েছিলো এই প্রাচীর দিয়ে।

শত্রুদের বিরুদ্ধে শহরের নিরাপত্তা বাড়াতে তিনি কালা'আতুল জাবাল (পাহাড় কেল্লা) নির্মাণ করেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিনি এর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। এই কেল্লা মিশরের একটি শ্রেষ্ঠ

পুরাকীর্তি এবং অনেকবার একে সংস্কার করা হয়েছে।

এছাড়া সুয়েজ শহরের সাতান্ন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে সিনাই উপদ্বীপে তিনি কালা'আত সিনা' (সিনাই কেল্লা) স্থাপন করেন। কেল্লার দক্ষিণাংশে দুটি মাসজিদ ও সুপেয় পানির একটি জলাধার নির্মাণ করা হয়। জলাধারের দরজায় লেখা ছিলো, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদের উপর। ইসলাম ও মুসলিমদের বাদশাহ, মুমিনদের নেতার খলিফা আন-নাসর সালাহউদ্দীনের নামকে আল্লাহ অমর করুন। এই জলাধার নির্মাণ করেন বাদশাহ 'আলী ইবনুন নাসির আল-'আদিল আল-মুযফার। নির্মাণকাল শা'বান, ৫৯০ হিজরি।"

শুধু সামরিক কাঠামোই না, সালাহউদ্দীন গিযা এবং আর-রুদাহ দ্বীপে দালানকোঠাও নির্মাণ করেন। এছাড়া নীলনদের গভীরতা মাপতে মিটার স্থাপন করেন এবং খাল খনন করেন। এছাড়া তিনি কায়রোতে মারস্তান হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এটি ছিলো বিশাল এক দাতব্য হাসপাতাল। তিনি একজন সুপ্রশিক্ষিত লোককে হাসপাতাল দেখাশোনা, ঔষধ ভাণ্ডার তত্ত্বাবধান ও রোগীদের যত্ন-আত্তির কাজে নিয়োগ করেন। রোগীদের জন্য এখানে বিছানা প্রস্তুত থাকতো। মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড ছিলো। মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্তদের জন্য লোহার গরাদ দেওয়া আলাদা জায়গা ছিলো এবং তাদের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট লোক নিযুক্ত থাকতো।

সালাহউদ্দীনের সময় গিযা এবং আর-রুদাহ ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি শহর।

ইবনু জুবাইর তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন:

> "গিযাতে প্রতি রবিবারে এক বিরাট বাজার বসতো। গিযা ও কায়রোকে পৃথককারী একটি দ্বীপে আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রাসাদ ছিলো। এছাড়া নীলনদে একটি উপসাগর দিয়েও এ দুটি পৃথক ছিলো। সেখানে এক বিশাল জামে মাসজিদ ছিলো। মাসজিদের পাশেই নীলনদের মিটার ছিলো যা দিয়ে পানির উচ্চতা পরিমাপ করা হতো। মিটারটিতে দামী পাথর-মার্বেল ইত্যাদি ছিলো।"

সালাহউদ্দীনের স্থল ও নৌসেনাদের প্রধান উৎস ছিলো মিশর। তিনি জাহাজ ও নৌবহর নির্মাণ করান এবং নৌসেনাদের পরিচালনার জন্য আল-'আদিলের নেতৃত্বে আলাদা বিভাগ স্থাপন করেন। আলেক্সান্দ্রিয়া আর দামিয়েট্টা ছিলো মিশরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর। আর আল-ফুস্তাত ও কুস ছিলো গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর। নৌপথে শত্রু আক্রমণ ঠেকাতে এসব জায়গায় যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন থাকতো। লক্ষ্য ছিলো একটাই, ইসলামের ঝাণ্ডাকে সুউচ্চে তুলে ধরা।

সালাহউদ্দীন খেয়াল করলেন যে ফ্র্যাংকরা আলেক্সান্দ্রিয়ার দিকে ছোঁকছোঁক করছে। তিনি সাবধানতাবশত এর প্রাচীর ও টাওয়ারগুলো সংস্কার করেন। কায়রোর মতো এখানেও একটি পাগলাগারদ ছিলো। *সুবহুল আ'শা* গ্রন্থের লেখক বলেন:

> "সুলতান মিশর জয় করার পর ৩৮৪ হিজরি সনে আল-'আযীয ইবনুল মু'ইযের নির্মিত একটি প্রাসাদের দখল নেন। হলঘরটিকে তিনি পাগলাগারদে রূপান্তরিত করেন। এছাড়া তিনি বিদেশী অতিথিদের জন্য একটি দালান নির্মাণ করেন। কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সেতু নির্মাণ ও খাল খননের সুপারিশ করেন।"

শিক্ষা সংস্কার

সালাহউদ্দীন 'ইলম ও 'আলিম সমাজকে ভালোবাসতেন। দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুনর্জাগরণে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠা করেননি। তিনি বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ স্থাপন করে কবি, লেখক, গবেষক এবং শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সেখানে মক্তব ব্যবস্থা চালু ছিলো। শিশুরা মক্তবে শাইখদের অধীনে থেকে কুর'আন ও হাদীস অধ্যয়ন করতো। তারা আরবি ক্যালিগ্রাফিতেও দক্ষতা অর্জন করতো। এছাড়া গণিত,

কাব্য, আরবি প্রবাদ এবং ইমামতি ও দু'আর নিয়মকানুন অধ্যয়ন করতো।

নাবালক থেকে সাবালক হওয়ার পর তারা ইচ্ছা করলে মিশর, সিরিয়া, মসুল, বাগদাদ ও মক্কায় 'ইলমের মারকাযগুলোতে গিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতো। যুক্তিবিদ্যা, কিরাআত, আদব ইত্যাদি শাস্ত্র মাসজিদ-মাদ্রাসাগুলোতে সবিস্তারে শেখানো হতো। বিভিন্ন আলিমের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুর'আনের তাফসিরও শিখতো তারা।

সালাহউদ্দীনের যুগে মাসজিদগুলো ছিলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি। 'ইবাদাত ও 'ইলম অর্জনে ব্যস্ত মানুষে টইটম্বুর ছিলো সেগুলো। তিলাওয়াত, তাফসির, শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, ছন্দ ও অলংকার শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী মানুষ বেরিয়ে আসতো সেখান থেকে।

কায়রোর সবচেয়ে বিখ্যাত মাসজিদ ছিলো 'আমর বিন আল-'আস মাসজিদ, আল-আযহার মাসজিদ, আল-আকমার মাসজিদ, আল-হাকিম বিআমরিল্লাহ মাসজিদ ও আল-হুসাইন মাসজিদ। ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানের প্রসারে আলেক্সান্দ্রিয়ার আল-'আত্তিন মাসজিদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সারা মিশরজুড়ে মাসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিলো।

শামের মাসজিদগুলোও একই কাজ করতো। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো দামেস্ক মাসজিদ। ইবনু জুবাইর দামেস্ক ভ্রমণকালে এই মাসজিদ দেখে অভিভূত হয়ে যান। দামেস্ক ছিলো জ্ঞানের মারকায। বিভিন্ন এলাকা থেকে আলিমগণ এখানে আসতেন। ত্রিপোলিতেও দারুল হিকমাহ (জ্ঞানকেন্দ্র) ছিলো। এখানেও বিশাল সংখ্যক ছাত্র ছিলো। মিশরের দারুল হিকমাহ'র সাথে সম্মিলিতভাবে এটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ভূমিকা রাখে।

মিশর, শাম এবং ৫৮৩ সালে জেরুজালেমের মুক্তির পর সেখানে স্থাপিত বিদ্যাপীঠগুলোতে বিরাট পরিসরে চার মাযহাবের উপর পড়াশোনা হতো। আস-সিয়ুফিয়াহ মাদ্রাসা হলো হানাফি মাযহাবের অধ্যয়নের জন্য সালাহউদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিদ্যালয়। বত্রিশটি দোকানের আয় দিয়ে এই মাদ্রাসা চালানো হতো এবং এখানকার শিক্ষকদেরকে ভালোরকম পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হতো। ক্রুসেড শেষ হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত মাদ্রাসাটি টিকে ছিলো।

তিনি নিজে ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। শাফি'ঈ মাযহাব অধ্যয়নের জন্য তিনি আস-সালিহিয়াহ মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি এ মাদ্রাসার দেখভাল করতেন এবং এর পরিসর প্রশস্ত করেন। তিনি এর পাশে একটি হাম্মামখানা, সামনে একটি রান্নাঘর ও অসংখ্য দোকান নির্মাণ করেন। আল-খুতাত গ্রন্থে আল-মাকরিযি লিখেছেন যে, সুলতান কায়রোর বাইরে নীলনদে অবস্থিত জাযিরাতুল ফীল (হাতিদ্বীপ) স্থাপন করেন।

৫৮৩ হিজরিতে জেরুজালেম মুক্ত করার পর তিনি সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করে আল-কাযী বাহাউদ্দীন ইবনু শাদ্দাদকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। অনেক ছাত্র সেখানে এসে জ্ঞান অর্জন করতো। ইবনু শাদ্দাদের খ্যাতিও এভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থাপিত সব বিদ্যাপীঠেই সালাহউদ্দীন বিভিন্ন জাগতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাশাস্ত্রের প্রসার তত্ত্বাবধান করেন। এসব শিক্ষালয়ে দুই দল শিক্ষক থাকতেন। এক দল শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ। অপরদল সেই দক্ষ দলের থেকে শুনে শুনে সেগুলো পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে ঠিকমতো সেগুলো শেখা হয়ে যায়। পুনরাবৃত্তিকারীরা দুর্বল ছাত্রদেরকে দক্ষ করে তুলতে প্রচুর শ্রম দিতেন। আজকের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রফেসরের থেকে লেকচারারের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে জ্ঞান পৌঁছানোর ধারাটি এই পদ্ধতিরই অনুরূপ।

এটা তো স্পষ্টই যে, এসব বিষয় শিক্ষা দান করা হতো সুন্নী মতাদর্শের প্রসারের জন্য। নূরুদ্দীন এমনটাই চেয়েছিলেন। জ্ঞানের জগতে তিনি ফাতিমিদের বাতিনি ভাবধারা উচ্ছেদ করতে তৎপর ছিলেন। সঠিক জ্ঞানে সজ্জিত এই বাহিনীকে নিয়ে তিনি যুদ্ধের জগতে ফ্র্যাংকদেরকে উচ্ছেদ করেন।

মিশরে সেসময় বইয়ের বিক্রিবাট্টা ছিলো তুঙ্গে। 'আমর ইবনুল 'আস মাসজিদের পাশেই এক বইয়ের বাজারে অমূল্য অনেক বই বিক্রয় হতো। এছাড়া দামেস্কেও এক বৈচিত্র্যময় বই-পুস্তকের বিশাল দোকানপাট ছিলো।

অর্থনৈতিক সংস্কার

সালাহউদ্দীনের শাসনামলে মুসলিম জাতির ধনভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। সেসময় রাষ্ট্রের আয়ের প্রচুর উৎস ছিলো। যেমন:

* ১। মিশরের ফাতিমিদের ধনসম্পদ সালাহউদ্দীনের হাতে আসে।
* ২। অমুসলিম নাগরিকরা জিযইয়া প্রদান করে।
* ৩। বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ নেওয়া হয়।
* ৪। প্রচুর গানীমাতের মাল পাওয়া যায়।
* ৫। চুক্তির মাধ্যমে মুসলিমদের অর্জিত জমিজমা থেকে প্রাপ্ত খেরাজ।

সালাহউদ্দীন এসব আয় জিহাদ, কেল্লা ও দূর্গ নির্মাণ, কাঠামো ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ বিভিন্ন জায়গায় খরচ করতেন।

যুদ্ধের কারণে যাতে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে সালাহউদ্দীন কৃষি ও সেচব্যবস্থার যত্ন নিতেন। মিশর ও শামের মধ্যে কৃষিজ ফসল আমদানি-রপ্তানি হতে থাকতো। এছাড়া অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামরিক লেনদেন তো আছেই। জালিম ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধেও দুটি দেশ একত্রে লড়াই করতো।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সেতুবন্ধন হিসেবে মিশরের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনকে তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন। এই বাণিজ্যের ফলে ইউরোপের অনেক শহরও লাভবান হয়। যেমন ইতালির ভেনিস ও পিসা। ভেনেশিয়ানরা আলেক্সান্দ্রিয়ায় আল-আইক বাজার স্থাপন করে।

সালাহউদ্দীন মিশর ও শামে বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন ও সংস্কার

করেন। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জিত হয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ৫৭৮ হিজরিতে ইবনু জুবাইর এসব বাণিজ্যকেন্দ্রের কয়েকটি পরিদর্শন করেন ও এগুলোর প্রশংসা করেন। হালাবের (আলেপ্পো) ব্যাপারে তিনি লিখেন:

> "এটি খুবই সুন্দর ও চমৎকার। বাজারগুলো বড়, প্রশস্ত, সুবিন্যস্ত ও দীর্ঘ। বিভিন্ন পণ্য ও উৎপাদন কারখানা তাদের নিজ নিজ জায়গায় বিন্যস্ত। প্রতিটি দোকান কাঠের ছাদযুক্ত। প্রতিটি দোকানই ব্যস্ত পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে দাঁড়াতে বাধ্য করবে। বেশিরভাগ দোকানই সুন্দর করে খোদাই করা পাথরের তৈরি।"

সালাহউদ্দীনের সময়ের শামের অন্তর্গত ত্রিপোলির বর্ণনা দিয়ে নাসির খসরু তাঁর সফরনামায় লেখেন:

> "আখ, টক কমলা, কলা, ও লেবুর খামার ও বাগানে ঘেরা সুন্দর একটি শহর এটি। এখানে চার, পাঁচ বা ছয়তলাবিশিষ্ট সুতা কারখানা আছে। রাস্তাঘাট-দোকানপাটগুলো এত পরিপাটি যে, দেখে মনে হয় প্রতিটি দোকানই সুসজ্জিত প্রাসাদ। শহরের মাঝখানে কারুকার্য খচিত এক বিশাল সুন্দর মাসজিদ। মাসজিদের উঠানের পরই বিশাল গম্বুজের নিচে মার্বেলের তৈরি চৌবাচ্চা। উঠানের মাঝখানে আছে হলুদ তামার তৈরি একটি ঝর্ণা। এই ঝর্ণার পানি পাঁচটি কলের মাধ্যমে বাজারের লোকদের তৃষ্ণা মেটায়। এখানে একটি কাজগকলও ছিলো। কিন্তু শহরটি বিজিত হওয়ার সময় কারখানাটি ধ্বংস হয়, এর ভেতরের লোকেরা নিহত হয় আর পাঠাগার, বিদ্যালয় ও কারখানা ছাই হয়ে যায়।"

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সালাহউদ্দীন শহর-বন্দরে দালানকোঠা নির্মাণ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মনোযোগী ছিলেন। ত্রিপোলির কাগজকলও সালাহউদ্দীনের অর্জন। ক্রুসেডের বদৌলতে এসব কারখানা তৈরির শিক্ষা ইউরোপে আমদানী হয়। সেখানে প্রথম কারখানা স্থাপিত হয় ১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বেলজিয়ামে। ষোড়শ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে কোনো কাগজকল ছিলোই না।

মূলত অস্ত্র, বুননশিল্প, রেশমি কাপড়, ঘোড়ার জিন ও কাঁচ উৎপাদন শিল্পকে সালাহউদ্দীন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। এছাড়া মৃত্তিকাশিল্প ও জাহাজশিল্পও সে যুগে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এছাড়া আরো অন্যান্য শিল্পও ছিলো যেগুলো মিলিয়ে অর্থনীতির চাকা সজোরে ঘুরতে থাকে।

সমাজ সংস্কার

সালাহউদ্দীনের সময়কার সামাজিক অবস্থা জুড়ে ছিলো ফ্র্যাংক ও অন্যান্য শত্রুদের সাথে জিহাদ ও প্রতিরোধ। লোক দেখানো বাহাদুরি, মিছে আত্মগৌরব ও বিলাস-প্রমোদের কোনো ছাপ ছিলো না।

সাধারণ পোশাক পরিধান, সাধারণ মানের খাবার গ্রহণ আর বিনয়ী ভঙ্গিতে বসার ক্ষেত্রে সালাহউদ্দীন ছিলেন সাধারণ সৈনিক ও জনগণের জন্য আদর্শ। আল-'ইমাদ আল-আসফাহানি তাঁর পোশাক-আশাক ও চাল-চলনের বর্ণনায় বলেন, "তিনি শুধু হালাল পোশাকই পরতেন। যেমন- লিনেন, সুতি বা পশমের। কেউ তাঁর সাথে বসলে মনেই হতো না যে সে সুলতানের পাশে বসে আছে।"

ঘোড়সওয়ারগিরি ও বল খেলায় সালাহউদ্দীন ছিলেন দক্ষ খেলুড়ে। যুহর সালাতের পর তিনি তাঁর লোকদেরকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে 'আসর পর্যন্ত পোলো খেলা দেখতেন। লোকলস্কর ও সঙ্গীসাথীদের সাথে তিনি খেলাধুলাও করতেন। শিকার করা ছিলো সে সময়কার মানুষের প্রিয় একটি শখ। শিকারী কুকুর, বাজপাখি ও নানারকম সরঞ্জাম ব্যবহার করে তাঁরা পাখি, মাছ, রাজহাঁস, খরগোশ ইত্যাদি শিকার করতেন।

এসব থেকেই বোঝা যায় শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনি সহজাতভাবেই গড়ে উঠেছিলেন। সালাহউদ্দীনের হাতে যেসব সমাজ সংস্কারমূলক কাজ হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফাতিমি যুগ থেকে চলে আসা বিভিন্ন অশ্লীলতা-পাপাচার বন্ধ করা। বিশেষ করে নওরোজ উৎসবে যেসব বিশ্রী কাজকারবার ঘটতো,

সেগুলো তিনি বন্ধ করে দেন।

সালাহউদ্দীন এসব পাপাচার-অশ্লীলতা বন্ধ করে দিয়ে ইসলামী নিয়ম মেনে জনগণকে পবিত্র জীবনযাপনের সুযোগ করে দেন। বিভিন্ন পালা-পার্বণে যেসব বিদ'আত ও ধর্মদ্রোহী কাজকারবার হতো, সেগুলোও তিনি বন্ধ করে দেন। যেমন- 'আশুরা'র দিনে (১০ই মুহাররম) মানুষ কান্নাকাটি আর মাতম করে একে শোকদিবস বানিয়ে ফেলেছিলো। কাজকর্ম থামিয়ে, দোকানপাট বন্ধ করে মানুষকে এমনভাবে বিরক্ত করা হতো যেন তাদের কাছের কেউ মরে গেছে। সালাহউদ্দীন এসব বিদ'আতকে উৎখাত করেন। শোকের এই দিনকে আনন্দের দিনে পরিণত করেন এবং এই দিনে দান-সদকার প্রচলন করেন। এটি রাসূলুল্লাহর ﷺ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সালাহউদ্দীন প্রজাদের প্রতি খুবই দানশীল ছিলেন। তিনি দারিদ্র্যের ভয় করতেন না। তাঁর কাছে টাকাপয়সা আর ধূলাবালি ছিলো সমান। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ তো আগেই বলা হয়েছে। মাত্র সাতচল্লিশ দিরহাম ও এক জুর্ম। কোনো বাড়ি, ক্ষেত-খামার বা প্রাসাদ তিনি রেখে যাননি।

তিনি যদি নিজের জন্য ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু না-ই নিয়ে থাকেন, তাহলে এত সম্পদ ব্যয় করেছেন কোথায়? এ সবই বণ্টিত হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, সামরিক খরচ, গোলাবারুদ প্রস্তুতি এবং গরীব-দুঃখীদের মাঝে। সালাহউদ্দীন চেয়েছিলেন ঐক্যবদ্ধ সমাজ, শক্তিশালী রাষ্ট্র, এবং মানুষের উন্নত জীবনমান।

সালাহউদ্দীন অনেক অন্যায় কর প্রত্যাহার করেন। বিশেষ করে মক্কার শাসক কর্তৃক হাজ্জযাত্রীদের উপর আরোপিত কর তিনি বাতিল করেন। হাজ্জযাত্রীরা জেদ্দায় ঢোকার আগে এই কর পরিশোধ করতে হতো। সালাহউদ্দীন এর বদলে নিজ খরচে মক্কার শাসককে আট হাজার আরদেব[৭৪] দিতেন এই শর্তে যে, মক্কার প্রকৃত গরীব-দুখীদের মাঝে তা বণ্টন করতে হবে। এভাবে তিনি হাজ্জীদের কষ্টও কমালেন, মক্কার দরিদ্র লোকদেরও উপকার করলেন।

সালাহউদ্দীন শান্তি প্রতিষ্ঠা, মুসলিমদের ঐক্য রক্ষা ও যুলুম প্রতিরোধে

[৭৪] আরদেব পরিমাপের একটি বড় একক যার সমমান হলো ২৪ সা'আ। এক সা'আ সমান ৩.৫ কিলোগ্রাম।

তৎপর ছিলেন। পুত্র আল-মালিক আয-যাহিরকে আলেপ্পোর শাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তিনি তাঁকে যে উপদেশ দেন, সেটির বাক্যগুলোতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনু শাদ্দাদ সেই উপদেশ উদ্ধৃত করেন:

> "আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার এবং তাঁর বিধি-বিধানগুলো প্রতিষ্ঠিত করার। কারণ এটিই নাজাতের পথ। রক্ত ঝরানোর ক্ষেত্রে সতর্ক হও, কারণ রক্ত কখনো (প্রতিশোধ না নিয়ে) থেমে থাকে না। আমি আদেশ দিচ্ছি আমার প্রতিনিধি এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে তুমি জনগণের অধিকার সংরক্ষণ কর ও যত্নশীল হও। রাজ-রাজড়া ও সম্ভ্রান্তদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবে যাতে তোমার লক্ষ্য অর্জিত হয়। সবারই মৃত্যু আসে, কাজেই কারো জন্য অন্তরে বিদ্বেষ পুষে রেখো না। কারো প্রতি অবিচার করবে না। কারণ মাযলুম তোমাকে মাফ না করলে আল্লাহও তোমাকে মাফ করবেন না। অথচ আল্লাহর অধিকার ক্ষুণ্ণ করলে তিনি তা মাফ করে দেন, তিনি তো ক্ষমাশীল।"

মোটকথা, সালাহউদ্দীনের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে মুসলিম সমাজ থেকে অশ্লীলতা-পাপাচার দূরীভূত হয়ে ইসলামী নীতি-নৈতিকতার পুনর্জাগরণ ঘটে।

ধর্মীয় সংস্কার

উপরে বলা হয়েছে সালাহউদ্দীন তাকওয়াসম্পন্ন, ঈমানদার ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী ইবাদাতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। ইবনু শাদ্দাদ বলেন, "তাঁর (রাহিমাহুল্লাহ) ঈমান ছিলো উত্তম এবং তিনি আল্লাহর অনেক যিকির করতেন। বড় বড় আলিম ও কাযিদের সাহচর্যে থেকে তিনি এসব গুণাবলি অর্জন করেন।" এমন ইসলামী শিক্ষা পেয়ে গড়ে ওঠা একজন মানুষের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশিত যে, তিনি দ্বীনি সংস্কার কার্যক্রম চালাবেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে দিবেন,

কুফরের অন্ধকার দূর করে ইসলামের আলোকবর্তিকা হবেন। সালাহউদ্দীনও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

দৃঢ় ঈমান ও ইয়াকীনে বলীয়ান হয়ে তিনি মুসলিম ভূমিগুলো থেকে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহের মূল উপড়ে ফেলেন। আলিম ও কাযিদের সাথে পরামর্শ করে তিনি আল্লাহর আইনের বিরোধিতাকারী লোকদেরকে হত্যা করতেন।

ফাতিমি খলিফার উজির হওয়ার পর মিশরের জনগণের ত্রুটিপূর্ণ আকিদা দেখে তিনি অত্যন্ত দুঃখ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম) সুন্নাহর সাথে এসব আকিদা সাংঘর্ষিক ছিলো। যেমন, এসব ফির্কা বিশ্বাস করতো যে নেতৃত্ব (ইমামতি) মানুষের হাতে নেই। এটি যেহেতু দ্বীনি বিষয়, তাই জনগণ নাকি কখনোই তাদের নেতা নির্বাচন করতে পারবে না। একজন নবীর নাকি কোনো অধিকার নেই জনগণকে এই কাজে অংশগ্রহণ করতে দেওয়ার। নবীকে নাকি মৃত্যুর আগে অবশ্যই একজন ইমাম নির্ধারণ করে দিয়ে যেতে হবে আর সেই ইমাম হবেন নবীদের মতোই পাপের ঊর্ধ্বে। তারা বিশ্বাস করতো যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আলীকে (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) ইমাম নিযুক্ত করে গেছেন, আর আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) ও ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) তাঁকে টপকে নেতা হয়ে ভুল করেছেন (না’উযুবিল্লাহ)। এসব যালিম আরো বিশ্বাস করতো যে, নেতা হওয়া মানুষেরা অবশ্যই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন আর নয়তো ঐশ্বরিক অবতার হবেন। তাদের কিছু ফির্কা এমনও বলে যে, যিনি মারা যাননি তাঁর মাধ্যমে ইমামতি স্থগিত হয়ে গেছে। তিনি এখন আত্মগোপন করে আছেন, শেষ জামানায় বেরিয়ে এসে ন্যায় প্রতিষ্ঠা শুরু করবেন। ৪০৮ হিজরিতে হামযাহ ইবনু ‘আলী ঘোষণা দেয় যে খলিফাই আল্লাহ। ফলে শি’য়াদের একটি দল ও ইসমা’ঈলীরা ফাতিমি খলিফা আল-হাকিম বিআমরিল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নেয়। না’উযুবিল্লাহ। এছাড়া সে একটি বইও প্রকাশ করে যাতে লেখা ছিলো, “ঐশ্বরিক ক্ষমতা অবতার রূপে আদমের মধ্যে আসে, তারপর সেখান থেকে ‘আলী ইবনু আবি তালিবের কাছে, সেখান থেকে আল-‘আযীযের কাছে, সেখান থেকে তার ছেলে আল-হাকিম বিআমরিল্লাহর কাছে। আর তাদের অবতারের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি আল্লাহয় পরিণত হয়েছেন।” বাতিনিদের মধ্যে অবতারের বিশ্বাস হামযাহ বিন ‘আলীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে উজির হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই সালাহউদ্দীনকে এসব বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হয় আর ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা সুন্নী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হয়। এর কয়েক মাস পরেই তিনি দেশ জুড়ে শিক্ষালয় স্থাপন শুরু করেন, যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো আন-নাসিরিইয়্যাহ মাদ্রাসা ও কামিলিয়্যাহ মাদ্রাসা। তিনি সর্বস্তরের মানুষকে এসকল বিদ্যাপীঠের সাথে জড়িত হয়ে বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেন।

বাতিলের বিরুদ্ধে সালাহউদ্দীনকে সাহায্য করেছিলো তাঁর প্রতি মিশরের জনগণের ভালোবাসা। দামিয়েট্টা ও গাযায় ফ্র্যাংকদের উপর জয়লাভ এবং মিশরীয়-অমিশরীয়দের হাজ্জযাত্রার পথ লোহিত সাগরের প্রবেশদ্বার আকাবা জয় করায় তিনি সবার ভালোবাসায় সিক্ত হন। এসকল বিজয়ে খুশি হয়ে মিশরীয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শি'য়া মতবাদ ছেড়ে সুন্নী মতবাদ গ্রহণ করে এবং সালাহউদ্দীনের সাথে মিলে আল্লাহর শত্রু ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আজকের মিশরের সুন্নীরা সালাহউদ্দীনের কাছে চিরঋণী।

শেষ কথা

এই ছিলো অবিস্মরণীয় বীর সুলতান ইউসুফ সালাহউদ্দীন আল-আইয়ুবীর জীবনের এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। তাঁর দ্বীনদারি, সাহসিকতা, দয়া, দৃঢ়তা, দানশীলতা, জিহাদ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। আরো দেখানো হয়েছে কীভাবে তিনি উত্তর ইরাক, কুর্দিস্তান, শাম, ইয়েমেন, মিশর ও বারকাহ সহ খণ্ড-বিখণ্ড মুসলিম ভূমি ও অন্তরগুলোকে ইসলামের পতাকার নিচে একত্র করেছেন। এই ইসলামী ঐক্যের খবরে বিশ্বের আনাচে কানাচের মুসলিমরা আনন্দিত হয়। অল্প সময় পরই তাঁর নেতৃত্বে হাত্তিনের মহাগুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করে জেরুজালেমের মুক্তি তরান্বিত করে। তিনি ফ্র্যাংক ও অন্যান্য পশ্চিমা কুফফার শক্তিগুলোকে পরাস্ত করেন। ক্রুসেডারদেরকে অ্যাকর ও ইয়াফফা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করে

ফেলেন। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পর ইসলামী বাহিনী ক্রুসেডারদেরকে মুসলিম ভূমিগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়।

ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। ইয়াহুদী ও উপনিবেশবাদী নব্য-ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রে উসমানী খিলাফাহর পতনের মাধ্যমে মুসলিমরা আবার ছোট ছোট জাতিরাষ্ট্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মুসলিমরা যখন বিভক্ত হচ্ছে, ততক্ষণে ইয়াহুদীরা ইসলামের প্রথম কিবলার ভূমিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে আর দিনে দিনে শক্তি-সামর্থ্যে বেড়ে চলেছে। অতীতের অবস্থা আর বর্তমানের অবস্থা হুবহু একইরকম। কিন্তু কোন সে কারণ, যার জন্য আজকের মুসলিমরা অতীতের মতো জয়লাভ করতে পারছে না?

* অতীতে ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য মুসলিমরা ইসলামের নামে যুদ্ধ করছে। আর আজকে যুদ্ধ করছে এমন সব জাতীয়তাবাদী মিথ্যা স্লোগানের নামে, যেসবের ব্যাপারে আল্লাহ্ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।

* অতীতে তারা জয়লাভ করেছে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করার কারণে। আর আজকে পূর্ব-পশ্চিম সবখান থেকে আমদানীকৃত মানবরচিত জগাখিচুড়ি দিয়ে মুসলিম ভূমিগুলো শাসিত হচ্ছে।

* অতীতে জয়লাভ করেছে শক্তিশালী এক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর। আর আজ পরাজিত হচ্ছে ছোট ছোট দুর্বল জাতিরাষ্ট্রে ভাগ হয়ে থাকার কারণে।

* অতীতে জয়লাভ করেছে আল্লাহর সাহায্যে ইয়াকীন করার কারণে। আজ তাদের ইয়াকীন হলো পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মতো যুলুমের হাতিয়ারগুলোর প্রতি।

* আজকে সাধারণভাবে মুসলিম ও বিশেষ করে আরব মুসলিম শাসকদেরকে ইতিহাস অধ্যয়ন করে জানতে হবে কীভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুরু করে আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণ বদর, কাদিসিয়াহ, ইয়ারমুক, হাত্তিন, 'আইন জালুতের যুদ্ধগুলো জিতেছে। তাঁদের মতো ঈমান-আকিদা, দ্বীনদারি-

ইবাদাত, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাহসিকতা-দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে।

তাদের আরো উচিত হবে আল্লাহর দেওয়া বিধানাবলি অধ্যয়ন করা, কুর'আন শিক্ষা করা। কারণ আল্লাহর হুকুমই সত্য, সুন্দর; এতেই প্রগতি, এতেই উন্নতি; ন্যায়, সমতা আর শান্তি এখানেই; এখানেই লুকিয়ে আছে শক্তি, বিজয় ও সভ্যতার রহস্য। আল্লাহ বলেন:

> তারা কি জাহিলি যুগের আইন-বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন-বিধান প্রদানে আল্লাহ হতে কে বেশি শ্রেষ্ঠ?[৭৫]

সালাহউদ্দীনকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন, উম্মাহর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেছেন, মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করেছেন, ক্রুসেডারদের নাপাক থাবা থেকে জেরুজালেমকে মুক্ত করেছেন। পূর্ব-পশ্চিমের ইতিহাসে সালাহউদ্দীনের এমন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকাটা তাই অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইতিহাস তাঁর জীবন, নৈতিকতা, বিরল সাহসিকতা, মহান সৌজন্যবোধ ও সংগ্রামের কাহিনী চিরকাল মনে রাখবে।

আমরা ইবনু শাদ্দাদের ভাষায় তাঁর জন্য দু'আ করি, "হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি আপনার রহমত প্রত্যাশী ছিলেন। তাঁকে আপনি রহম করুন।"

আমরা আরো দু'আ করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সালাহউদ্দীনের মতো আরেকজন নেতা দেন যিনি জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন সহ সকল মুসলিম ভূমিগুলোকে ইয়াহুদী ও নব্য-ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করবেন।

সেদিন মু'মিনরা আনন্দ করবে। (সে বিজয় অর্জিত হবে) আল্লাহর সাহায্যে। যাকে ইচ্ছে তিনি সাহায্য করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, বড়ই দয়ালু। [৭৬]

আল্লাহর কাছে দু'আ করে কবি বলেন:

কত শত পথে ভাগ হয়ে গেছে হায় মোদের হৃদয়গুলো,
রব্বের কাছে যে দু হাত তুলে আজ দু'আর সময় এলো!

---

[৭৫] সূরাহ আল-মা'ইদাহ ৫:৫০
[৭৬] সূরাহ আর-রূম ৩০: ৪-৫

হে আল্লাহ! দাও সে শাসক, ইসলামের তরে যে কুরবান,
মুসলিমদের প্রতি সে আর তার প্রতি তুমি থাকবে মেহেরবান।

সমাপ্ত

শাইখ সা'ইদ হাওয়ার অভিমত

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী সম্পর্কে লেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে লেখক যথাযথ কাজ করেছেন। কারণ,

প্রথমত, আজ মুসলিম উম্মাহর সালাহউদ্দীনের মতো একজন বীরের বড় বেশি প্রয়োজন। তাই তাঁর অনুরূপ ব্যক্তি খুঁজে পেতে হলে তাঁর জীবনচরিত অধ্যয়ন অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, জেরুজালেম বর্তমানে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একে স্বাধীন করতে হলে আমাদের জানতে হবে যে, আমাদের পূর্বসূরিগণ কোন পথে হেঁটে জেরুজালেমের মুক্তি এনেছিলেন।

তৃতীয়ত, আমাদের মুসলিম উম্মাহ সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে সরে গেছে এবং আমাদের আদর্শ ব্যক্তিদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাই এই উম্মাহর উচিত সেই আদর্শধারী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা, যাদের মধ্যে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী অন্যতম।

চতুর্থত, এই উম্মাহ জিহাদ পরিত্যাগ করেছে, যা ফিলিস্তিন দখলমুক্ত করার একমাত্র পথ। উল্টো মুসলিমরা আজ লোভ-লালসার পথ ও দ্বীনের বিধিবিধান সম্পর্কে কুতর্ক করার পথ ধরেছে। তাই সালাহউদ্দীনের বিস্তারিত জীবনী আলোচনার মাধ্যমে এসব কুতর্কের পথ রুদ্ধ করা জরুরি।

অতএব, লেখকের সিদ্ধান্ত সঠিক। আমরা আশা করি মুসলিমরা বিজয় অর্জনের

মাধ্যমগুলো ব্যবহার করতে জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

এছাড়া সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর বিচক্ষণতার উৎস ও তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসার কারণ ছিলো ইসলাম। তাঁর উপর মানুষের আস্থা এবং উম্মাহর ঈমান ছিলো জেরুজালেম মুক্তির কারণ। আজকের মুসলিম নেতাদের উচিৎ সালাহউদ্দীনের কাছ থেকে নেতৃত্বের সঠিক গুণাবলি শিখে নেওয়া।

আমাদের সামনে একমাত্র পথ হলো ফিলিস্তিন ইশ্যুকে মুসলিম উম্মাহর হাজার বছরের আবহমান আশা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের আলোকে দেখতে শেখা। সালাহউদ্দীনের স্মৃতি আজও অম্লান, কারণ তিনি এই পথেই এগিয়েছিলেন।

যারা ভাবে নেতৃত্বের গুণাবলি হলো ফাঁকা বুলি ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, তারা ভুল করছে। তারা এই পথে চলতে থাকলে অনাগত প্রজন্ম তাদের অভিশাপ দেবে এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে।

যারাই বিশ্বাস করে যে মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন ঐতিহ্য বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরে ফিলিস্তিন মুক্ত করা যাবে, তারাই আল্লাহ্‌র গযব, প্রজন্মের বদদু'আ ও ইতিহাসের তিরস্কার ভোগ করবে।

যুগ যুগ ধরে এই দ্বীনের কেন্দ্রীয় একটি বিষয় হয়ে রয়েছে এই ফিলিস্তিন ইশ্যু। আমাদের গৌরব ও বীরত্বের স্মারকও এটিই। ক্রুসেডার ষড়যন্ত্রের বিনাশ শুরু হয়েছে ইসলামের পতাকাতলে শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তিন) ও মিশরের একীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে। আব্বাসি খিলাফাতের অধীনে থাকা মুসলিম বিশ্বের সমর্থনও প্রয়োজন ছিলো এই ঐক্যের জন্য। আজকেও ফিলিস্তিন সংকট সমাধান করতে হলে ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার ভিত্তিতে এমন ঐক্য গড়তে হবে। পুরো মুসলিম বিশ্বেরই সহযোগিতা প্রয়োজন। এই বইটি সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে এক বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ। আমাদের উচিৎ বইটি পাঠ করা, বিতরণ করা ও উপহার দেওয়া। আল্লাহ্ এই বইয়ের রচয়িতাকে রহম করুন।

-শাইখ সা'ইদ হাওয়া

প্রখ্যাত কবি ও অধ্যাপক আব্দুল জব্বার আর-রাহবির অভিমত

অসাধারণ বিশেষজ্ঞ ও দ্বীনদার অধ্যাপক আব্দুল্লাহ নাসিহ উলওয়ানের প্রতি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাহাতুহু। কেমন আছেন, অধ্যাপক উলওয়ান? আমাদের বন্ধুবর, জ্ঞানী-গুণী, মহান ভাই অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আত-তানতাওয়ির উপস্থিতিতে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আল্লাহ্‌র দ্বীনের মুজাহিদ, মুশরিক ও উপনিবেশবাদী শত্রুদের হাত থেকে মুসলিম ভূমিগুলোকে পবিত্রকারী, ন্যায়পরায়ণ মুসলিম সম্রাট সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর জীবনী নিয়ে আপনার বইটি আপনার কাছ থেকেই উপহার পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি বইটি পড়েছি, ইতিহাসের মূল্যবান শিক্ষা আহরণ করেছি; যে ইতিহাস বীরত্ব, জিহাদ, সততা ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ। তাই আমি এই উপহারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটি কাব্য রচনা করতে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আপনার খেদমতে তা এখানে পেশ করলাম।

সালাহ আদ-দ্বীন

আল্লাহ্‌ তোমায় প্রতিদান দিন, হে আল্লাহ্‌র দাস!

কলমে যে লিখেছো তুমি সালাহউদ্দীনের ইতিহাস।

লিপিবদ্ধ হয়েছে এতে এক মহানেতার কাহিনী

আরও যত বীর ইসলামের তরে হাঁকিয়েছে বাহিনী।
মুসলিম জাতি তাঁদেরই অধীনে মেনেছে ইসলামী শাস্ত্র,
তাঁদের হাতে গড়ে উঠেছে ন্যায়ানুগ ইসলামী রাষ্ট্র।
তাঁরা যে করেছেন আল্লাহ্র পথে বারেবারে এ জিহাদ
তাই ইতিহাস জানায় তাঁদের অবিরত সাধুবাদ।
ভূমিগুলো সব মুক্ত করে তাঁরা তাড়ালেন হানাদার,
দামিয়েট্টা, গাযা, হাত্তিন যেন ফিরে আসে বারেবার।
গোলানে ইউরো রাজারা লুটায় ইমাদুদ্দীনের পায়ে,
ইয়াফফা-অ্যাকরে নূরুদ্দীন যেন বজ্রের ন্যায় বয়ে যায়।
ভুলবে না কেউ সালাহউদ্দীনের বিজয়, ন্যায় আর দয়া,
যুগ যুগ ধরে তাঁর ইতিহাস একেবারে থাকে নয়া।
উলওয়ান ভাই, তোমার জন্য শুভকামনাই শুধু,
সুবাসিত তা ফুলেরই মতো আর রূপে যেন নয়াবধূ।

সবশেষে আমার সবিশেষ অভিবাদন জানাচ্ছি।

ইতি

আব্দুল জাব্বার আর-রাহবি

৬ই মার্চ, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

গ্রন্থপঞ্জি

ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত্তারিখ*

ইবনু খালিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*

ইবনু জুবাইর, *রিহলাত ইবনু জুবাইর*

আবু শামাহ, *কিতাবুর রাওদাতাইন ফী আখবারুদ দাওলাতাইন*

ইবনু শাদ্দাদ, *আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়্যাহ*

আল-মাহাসিন আল-ইউসুফিয়্যাহ

আবুল মাহাসিন, *আন-নুজুমুয যাহিরাহ ফি মুলুক মিস্র ওয়াল কাহিরাহ*

ইয়াকুত আল-হামাওয়ি, *মু'জামুল বুলদান*

জামালুদ্দীন আর-রামাদি, *সালাহউদ্দীন আল-আইয়ুবী*

আহমাদ বায়িলি, *হায়াতু সালাহউদ্দীন*

আহমাদ আহমাদ বাদাওয়ি, সালাহউদ্দীন বাইনা শু'রা' *'আসরিহি ওয়া খুত্তাবিহ*

সা'ইদ আব্দুল ফাত্তাহ 'আশুর, *আন-নাসির সালাহউদ্দীন*

'আব্দুল 'আযীয সাইয়্যিদুল আহল, *আইয়্যাম সালাহউদ্দীন*

মুহাম্মাদ আল-'আরুসি, *আল-হুরুবুস সলিবিয়্যাহ ফিল মাশরিক ওয়াল মাঘরিব*

হাসসান ইবরাহীম হাসসান, *তারিখুল ইসলাম আস-সিয়াসি*

মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ ‘আনান, *মাওয়াকিফ হাসিমাহ ফী তারিখুল ইসলাম*

মুহাম্মাদ আল-গাযালি, *আত-তা’আসুব ওয়াত্তাসামুহ বাইনাল মাসিহিয়্যাহ ওয়াল ইসলাম*

মুহাম্মাদ নিমরুল খাতিব, *আল-ঈমান তারিকুনা ইলান-নাসর*

ইউসুফ আল-কারযাবী, *দারসুন নাকবাহ আস-সানিয়াহ*

টি ডাব্লিও আর্নল্ড, *দা’ওয়াহ ইলাল ইসলাম*

সমর্পণ এর প্রকাশিত বইসমূহ

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা	ডা. রাফান আহমেদ
সংবিৎ	জাকারিয়া মাসুদ
অ্যান্টিডোট	আশরাফুল আলম সাকিফ
অন্ধকার থেকে আলোতে	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার
জীবনের সহজ পাঠ	রেহনুমা বিনত আনিস
রৌদ্রময়ী	১৬ জন লেখিকা
সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.)	শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.)
হারিয়ে যাওয়া মুক্তো	শিহাব আহমেদ তুহিন
হুজুর হয়ে হাসো কেন?	হুজুর হয়ে টিম

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

বাতায়ন	মুসলিম মিডিয়া
অংশু	হোসাইন শাকিল
শিশুতোষ সিরিজ	সংস্কারকবৃন্দ
ইসলামে রিযিকের ধারণা	মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম

কে তোমার রব?

কে তোমার নবি?

কী তোমার দ্বীন?

জাতীয়তাবাদ

বিয়ে

ফেমিনিজম

লেখক পরিচিতি

শাইখ আব্দুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.) ১৯২৮ সালে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে জন্মগ্রহণ করেন। উনি পড়াশোনা করেছেন মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। আল আযহার থেকে বিএ এবং এমএ সমাপ্ত করে শাইখ উলওয়ান পাকিস্তানে চলে আসেন এবং ইসলামিক স্টাডিজে পিএইচডি সমাপ্ত করেন। কর্মজীবনে শাইখ উলওয়ান সৌদি আরবের কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

লেখক হিসেবে শাইখের বেশ সুখ্যাতি রয়েছে বিশ্বব্যাপী। শাইখ উলওয়ান ত্রিশটিরও বেশি কিতাব রচনা করেছেন যার অনেকগুলোই একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শাইখের উল্লেখযোগ্য কিতাবের মধ্যে রয়েছে *তারবিয়াত আল আওলাদ ফিল ইসলাম, আত-তাকাফুল আল ইজতিমায়ি ফিল ইসলাম, ফাযায়িল আস-সিয়াম ওয়া আহকামুহ, হুকম আততামিন ফিল ইসলাম, হুররিয়্যাত আল ইতিকাদ ফি আশ-শারিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ* ইত্যাদি।

এই মহান আলেমেদ্বীন ২৯ আগস্ট, ১৯৮৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

বইটি কেন পড়বেন?

১. বইটি কলেবরে এত বিশাল নয় যে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে, তবে বইটি কম্প্রিহেন্সিভ। সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর (রহ.) জীবনের উপর অতি খুঁটিনাটি নয়, বরং একটি গোছানো ফ্লো-চার্ট পাওয়া যাবে।

২. বইটিতে সালাহউদ্দীনের জীবনী বর্ণনা করে যাওয়ার চেয়ে উনার জীবন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বইয়ের একটা বড় অংশ জুড়েই পাঠক জানতে পারবে সালাহউদ্দীনের জীবন থেকে আমাদের কী শেখার আছে।

৩. সালাহউদ্দীন কেন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, আজ আমরা কেন হেরে যাচ্ছি, তাঁর শক্তির জায়গা কী ছিল, তাঁর কৌশল কেমন ছিল, আজ আমাদের দুর্বলতা কী এসব বিষয় লেখক এখানে দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৫. বইটি লেখা হয় সত্তরের দশকে। লেখক যখন বইটি লিখেন তার কিছু সময় আগেই জেরুজালেম দখল করে রাখা ইসরায়েলের সাথে আরবদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সেসব তাজা ঘটনার আলোকে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে ইসলামি জিহাদ জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন ভ্রান্ত আদর্শ, স্লোগানের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। কীভাবে মুসলিম উম্মাহ তার সোনালী ইতিহাস থেকে দূরে সরে গেছে। যা পাঠককে চিন্তার খোরাক যোগাবে ইন-শা-আল্লাহ্।

বর্তমান বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উপর কাফের-মুশরিক জোটের সম্মিলিত আগ্রাসন, পবিত্র ভূমি জেরুজালেম বে-দখল আর শামের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে আমরা ইতিহাসের মহাবীর সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর (রহঃ) সময়ের সাথে কিছুটা মেলাতে পারি। দুনিয়া আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অন্ধ মুসলিম শাসকবর্গ যখন উম্মাহকে ভুলে গিয়েছিলো, একজন সালাহউদ্দীন সেদিন একাই একটি উম্মাহ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। মিশর হয়ে শামে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন, জেরুজালেমকে কাফেরদের হাত থেকে পবিত্র করেছেন, আর সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে সাহসিকতা, বিচক্ষণতা আর মহানুভবতার যে নজির রেখে গেছেন সেটা মুসলিম বিশ্ব তো বটেই; অমুসলিম ইতিহাসবিদরাও গুরুত্বের সাথে স্মরণ রেখেছেন। এই বইটি থেকে যদি পাঠকরা উপকৃত হয়, আমাদের মায়েরা যদি তাঁদের সন্তানদেরকে একেকজন সালাহউদ্দীন আইয়ুবী হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন বুনে, যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মাঝে সালাহউদ্দীনের মত দ্বীনের সম্মানে ঝাঁপিয়ে পড়ার সেই পৌরুষ ফিরে আসে, তবেই আমরা স্বার্থক ইনশাআলাহ।

- সম্পাদক